১৮ এপ্রিল ১৯৮৪
২.৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

গল্পমেলা

রতন ভট্টাচার্যের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
আজব চিড়িয়াখানা

শুধুমাত্র জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার-ই তার নিজস্ব অনন্য ৩-মুখী ক্রিয়া দ্বারা ঘামাচি হওয়া রোধ করে ও তার মোকাবিলা করে

OBM-2515 BN

কেবলমাত্র জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারে আছে এক প্রমাণিত ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা, যেটি ৩টি কার্যকরী উপায়ে কাজ করে:

- **রোধ**
এর ব্যাকটিরিওস্ট্যাটিক ক্রিয়া ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার প্রসারকে রোধ করে।
- **আরাম**
মনোরম সুবাসভরা জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আর্দ্রতা শুষে নেয় আর তাড়াতাড়ি আরাম দেয়।
- **ক্রিয়া**
জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের এক অনন্য কেরাটোলিটিক ক্রিয়া ঘামাচিতে আক্রান্ত ত্বককে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দেয়।

Johnson & Johnson

জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার, ঘামাচির হাত থেকে আপনার সর্বোত্তম সুরক্ষা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
আজব চিড়িয়াখানা ৪৮
রতন ভট্টাচার্য
বড়গল্প
নরোত্তম-সংবাদ ৬
রেবন্ত গোস্বামী
কবিতা ও ছড়া
বৈশাখ ৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র
যাঁরা আপন ১৮
উৎপল চৌধুরী
ভুতুড়ে ১৮
রথীন্দ্রনাথ রায়
বোঝাপড়া ২৯
মৃণালকান্তি দাশ
ইতিহাসের গল্প
টোপিওয়ালা ও একটি খুনের গল্প ৩১
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
অন্যান্য গল্প
আদর্শ ভোজন ১৫
গৌরী মিত্র
জাতিস্মর ৪৪
মঞ্জিল সেন
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে ১৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে ৪০
পঙ্কজ রায়
স্কুলের খবর ও লেখাপড়া
বালি বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয় ২৭
সহজে ইংরেজি ৯৩
খেলাধুলো, কমিক্স, ধাঁধা-মজা
শব্দসন্ধান, তোমাদের পাতা

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

মেঘ ডাকে গুরুগুরু,
ছুটে আসে ঝড়,
এখনই হল যে শুরু
নতুন বছর।
উড়ুক দুঃখ-শোক
ঝঞ্ঝাতে ওই,
চূড়ান্ত ভাল হোক
একানব্বই।

৫ বৈশাখ ১৩৯১ ● ১৮ এপ্রিল ১৯৮৪ ● ১০ বর্ষ ১ সংখ্যা

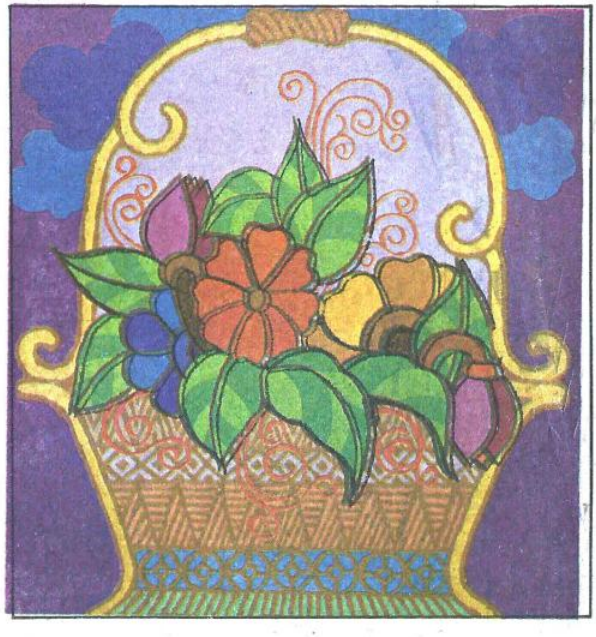

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট
ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের সবখানে ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

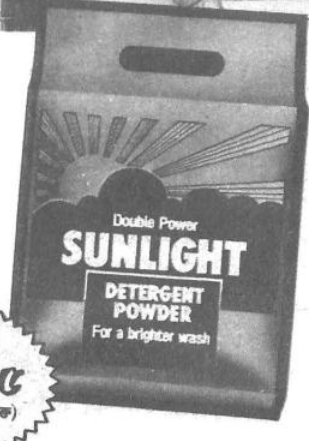

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বৈশাখ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দিনে আকাশ
খাঁখাঁ রোদে জ্বলন্ত
রাতের হাওয়া থেকে-থেকে
বইতেই যায় ভুলে।
নতুন বছর শুরু করার
এটা কেমন সময়,
মাসটা ঠেলে
মাথার ওপর তুলে ?

আরও কতই ছিল ঋতু
বসন্ত শীত শরৎ
ফসল পাকার সোনালি অঘ্রান।
তার বদলে বৈশাখটা
কোন্ মহিমায় শুনি
কেমন করে পেল এ-সম্মান ?

পাঁজি লেখার পণ্ডিতেরা
কোন্ সে আদ্যিকালে
জানতেন কি এ-মাস হবে
বিশ্বকবির জন্মদিনে ধন্য ?
নইলে এত খাতির কিসের জন্য ?

ও, বুঝেছি, ঠিক বুঝেছি !
তপনতাপে শুদ্ধ
বছর শুরুর দিনটি যা দেয়—
দুঃসাহসী দূরের পাড়ির ডাক।
তার মাস কি পবিত্র বৈশাখ !

ছবি অনুপ রায়

নরোত্তম-সংবাদ

রেবন্ত গোস্বামী

ডক্টর সাত্যকি সোমের বাড়ি থেকে যেদিন ওরকমভাবে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেদিন লজ্জা আর অপমানে কান লাল হয়ে উঠেছিল ঠিকই, তবু তার চেয়েও বেশি আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল একটা বিস্ময়। সাত্যকিবাবুর মতন একজন পণ্ডিত, নিখুঁত ভদ্রলোক, তিনিও যে আর-পাঁচজন সাধারণ লোকের মতন মনে মুখে দুই রূপ নিয়ে থাকেন, সেটা আমাকে আঘাত করেছিল। অবশ্য তিনি যে কৌশলে আমার ওপর ওভাবে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, সেটা বিশ্বাস করতে এখনও মন চায় না। হয়তো সত্যিই সেদিন যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে নরোত্তম ওরকম বাঁদরামি (নাকি, রোবোটামি ?) করেছিল।

শনিচক্রের সদস্য উদ্দালক রুদ্র একদিন বললেন, ডক্টর সোম নাকি কী এক কারণে, নরোত্তমের উপর রেগে গিয়ে তার ফাঁসি দিয়েছেন। ডাঃ গুপ্তমল্লিক বললেন, "ভেতরের লোকটা বোধহয় মাইনে বাড়াতে বলছিল।" তাই শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি অবশ্য সেই ফাঁকে উঠে পড়েছিলাম। সদস্যরা আমার ব্যাপারটা জানেন না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, সত্যিই নরোত্তমরা এ-জগতে থাকতে পারে না। সাত্যকি সোম মিষ্টি কথার মোড়কে

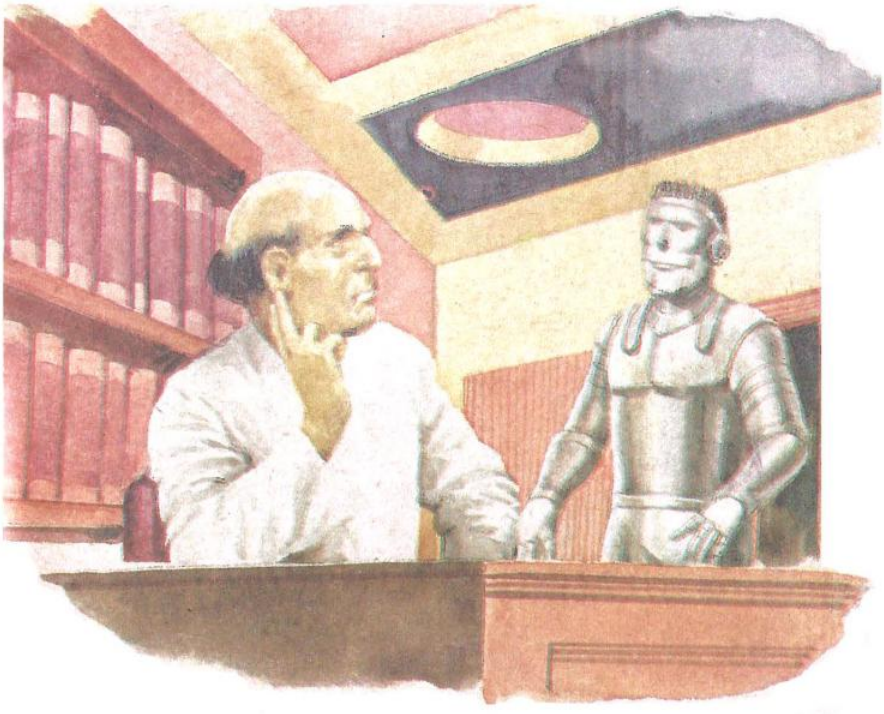

আমাকে ঠকাচ্ছিলেন। না জানতে পারলে কী এমন ক্ষতি হত আমার? নরোত্তম ধরিয়ে দিয়েই ফ্যাসাদ বাধাল।

তবে নরোত্তম আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এনেছে সেটা বুঝতে পারি। আজও আমি শনিচক্রের বৈঠকে যাই। নির্দোষ আড্ডা, আলোচনায় শরীর আর মন দুটোই ভাল থাকে। জ্ঞান বাড়ে। সমাজে থাকতে গেলে কচ্ছপের মতন খোলার মধ্যে থাকা যায় না। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গটা ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও উঠে পড়ি। ওটা আমার আর ভাল লাগে না। বুঝি যে, এর ফলে বেশিরভাগ দিনই আলোচনার বিষয়বস্তু হই আমি নিজেই। তা হলেও আমার মনে এসব আর দাগ কাটে না। আজ সাত্যকিবাবুর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো বলতেও পারব, "ডক্টর সোম, ঐ ম-এ-মু-আ ক্যাপসুল তো আপনি যে-কোনো লোকের রক্তেই করতে পারেন। এমন কী, আপনার নিজেরও ..."

ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে গেলে, শনিচক্র ক্লাবের কথা থেকেই শুরু করতে হয়। আমাদের পাড়ার পার্কটার কোণে প্রতি শনিবার সন্ধেবেলায় যে ফুটবলের মতন দেখতে ঘরটাকে দেখা যায়, ওটাই আমাদের শনিচক্রের আড্ডাখানা। সদস্যদের মধ্যে অধ্যাপক, আইনজীবী,

অফিসকর্মী থেকে আরম্ভ করে আমার মতন স্বগৃহে ভোজন সেরে বন্যমহিষ বিতাড়নের কাজে দক্ষ লোক, সকলেই আছে। প্রতি শনিবার বিকেলে ক্লাবের এই ঘরটাকে জুড়ে তৈরি করা হয়। আবার বৈঠক হয়ে গেলে পার্কের এক রোবট দারোয়ান এসে কয়েকমিনিটের মধ্যে ঘরটার টুকরোগুলো খুলে ফেলে খোলা অংশগুলো পার্কের একপাশে গুদামঘরে রেখে দেয়। তার জন্যে কিছু ভাড়া অবশ্য ক্লাবটা দিয়ে থাকে। এভাবে তো আজকাল, এই একবিংশ শতাব্দীর শেষে, অনেক বাড়িঘরই তৈরি হচ্ছে।

শনিচক্রের এই ঘরটাকে তৈরি করেছিলেন আমাদেরই এক এঞ্জিনিয়ার-বন্ধু অভিমন্যু রায়। ক্লাব ঘরটা দেখতে অনেকটা শনিগ্রহেরই মতন। গোলাকার ঘরটা লাট্টুর আলের মতন একটা শিকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশে কোনাকুনিভাবে যে বলয়টাকে দেখা যায়, সেটা আসলে নীচের থেকে ক্লাবঘরে উঠবার চলন্ত সিঁড়ি বা এসকেলেটর। এটা একপাশে ঘরটার দরজাটাকে এমনভাবে ছুঁয়ে গিয়েছে যে, এর সাহায্যে ওপরে উঠে ঘরে ঢুকতে কোনো অসুবিধেই নেই। এখনকার সবকিছুর মতন এটাও জমিয়ে রাখা সৌরশক্তিতেই কাজ করে।

যাই হোক, আমাদের বৈঠকে সব প্রসঙ্গই আলোচিত হয়। সাহিত্য, খেলাধুলো, অর্থনৈতিক সমস্যা—যেমন, সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে যাত্রায় অস্বাভাবিক ভাড়াবৃদ্ধি, বিচিত্র সংবাদ—যেমন, চাঁদে নতুন আবিষ্কৃত হিরের খনির কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সব কিছুর পরে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রসঙ্গটা থাকবেই। কারণ, এটা সবার প্রিয় বিষয়। যেমন, খাওয়ার শেষে চাটনি দই আর মিষ্টি। এটা হল, যিনি সেদিন বৈঠকে আসতে পারেননি, তাঁর কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে কি না, বা আর কোনো অসুবিধে দেখা দিয়েছে কি না, এসব ব্যাপারে বন্ধুর মতন খোঁজখবর নেওয়া আর কী। এই যেমন, গতমাসে একদিন চন্দ্রকীর্তিবাবু এলেন না। কেন এলেন না, এ-ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতেই শাতকর্ণিবাবু বললেন, "চন্দ্রকীর্তিবাবু আসবেন কী করে ? তাঁর রোবটটা নাকি আগের দিন তাঁকে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে।" (ব্যাপারটা আসলে, রোবটের হাতটা হঠাৎ নীচে নেমে পড়াতে চন্দ্রকীর্তিবাবুর কাঁধে লেগেছিল।)

সবাই আগ্রহে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শীলভদ্রবাবু বললেন, "রোবট তো বিনে কারণে এরকম করে না। নিশ্চয় চাঁদুবাবুর কিছু অস্বাভাবিকতা দেখেছিল সে।"

একদিন চন্দ্রকীর্তিবাবুকে বাজারে জিনিসপত্রের দামের ব্যাপারে গজ্‌গজ্ করতে দেখেছিলাম আমি। সে-কথা বলতেই সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, "বলেন কী ! চাঁদুবাবুর মাথার গোলমাল আরম্ভ হয়েছে নাকি ?"

বাণভট্টবাবু বললেন, "চাঁদুবাবুকে ছেলেবেলায় একবার ইঁদুরে কামড়েছিল। চাঁদুবাবু নিজে একথা বলেছিলেন।"

সবাই তাই শুনে বিস্ফারিত চোখে পরস্পরের দিকে তাকালেন। বৈঠক শেষ হওয়ার সময় আমরা মোটামুটি জেনে গেলাম, চন্দ্রকীর্তিবাবু বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন।

এরকম বিষয় থাকলে ক্লাবের বৈঠক ভাঙতে বেশ রাত হয়ে যায়। আমাদেরই ক্লাবের এক সদস্যের কুশলসংবাদ বলে কথা !

সাত্যকিবাবুর মতন একজন বিজ্ঞানীকে সম্বর্ধনা জানানোর মতো ব্যাপারটা অবশ্য শনিচক্রে প্রথম। ডক্টর সাত্যকি সোম আমাদের ক্লাবের সদস্য নন। তবুও আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব নিলাম। আমাদের আমন্ত্রণে আর অনুরোধে এক শনিবার তিনি আমাদের ক্লাবে এলেন।

সেদিন অনুষ্ঠানে সভাপতি হলেন আমাদের প্রবীণতম সদস্য সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর দ্বৈপায়ন বসু। তিনি প্রথমেই সাত্যকিবাবুকে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্যে এক গোগুলপ্লেক্স ধন্যবাদ দিলেন। একের পরে একশোটা শূন্য দিলে যে বিরাট সংখ্যাটি হয়, তা হল এক গোগুল। আর গোগুলপ্লেক্স হচ্ছে এক অকল্পনীয় মহাসংখ্যা। কয়েক কোটি কিলোমিটার লম্বা কাগজ দিলেও সেই সংখ্যাটা লেখা যাবে না। তাই সাত্যকিবাবু শুধু একটু মৃদু হাসলেন। সব কিছুতেই তিনি এরকম মৃদু হাসেন। তাতে দ্বৈপায়নবাবু যেন একটু থতমত খেলেন, মনে হল। তিনি আর বেশি কিছু না বলে শনিচক্রের তরফ থেকে একটি উপহার সাত্যকি সোমের হাতে তুলে দিলেন।

এবার আমরা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলাম। সবই তাঁর গবেষণা সম্পর্কে। আমাদের মধ্যে তাঁর গবেষণা বোঝার মতো বিজ্ঞানী কেউ নেই। তাই একটার উত্তর পাওয়ার আগেই আরো অনেক প্রশ্ন ছুটে এল। এবার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করে সাত্যকিবাবু ফের একটু মৃদু হাসলেন। তাতেই কাজ হল। একটি বর্ণপরিচয়-পড়া শিশুকে বীজগণিতের বই খুলতে দেখলে আমরা যেরকম কৌতুক বোধ করে হাসি, সাত্যকিবাবুর হাসিটাও আমাদের কাছে সেইরকম লাগল।

সাত্যকিবাবু লোক হিসেবে অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনারা আমার যে-কাজে আগ্রহবোধ করবেন, সেরকম একটা সৃষ্টির কথা আমি আপনাদের বলছি। আমি একটা রোবট তৈরি করেছি।"

আমরা সবাই অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। রোবট তৈরি আবার একটা কাজ নাকি! এই শহরে রাস্তাঘাটেই তো কত রোবট ঘুরছে। ঐ তো জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, পার্কে একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে এক রোবট। অনেক বাড়িতেই রোবট আছে। কেউ রান্না করে, কেউ ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ায়, কেউ খেলাধুলোর সঙ্গী হয়।

আমাদের মনের কথা যেন এবারেও বুঝতে পারলেন সাত্যকিবাবু। বললেন, "আমার রোবট সাধারণ কর্মী-রোবট নয়। ওটা হুবহু একটা মানুষের মতন। একজন মানুষের যা দোষগুণ—সেই সাহস, ভয়, লজ্জা, ক্রোধ, ভদ্রতা—সবকিছুই তার আছে। বলতে গেলে, সে আপনার আমার মতন সাধারণ একজন মানুষ।"

আমরা সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠলাম, "কী আশ্চর্য! অদ্ভুত! আপনি সত্যিই একজন মহৎ প্রতিভা, ডক্টর সোম!"

সাত্যকিবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, "এই যে প্রত্যেকটি দোষ গুণ বা মানসিক অবস্থা, যাই বলুন না কেন, তার জন্যে রোবটের মাথায় লাগানো আছে ফিউজের মতন আলাদা আলাদা

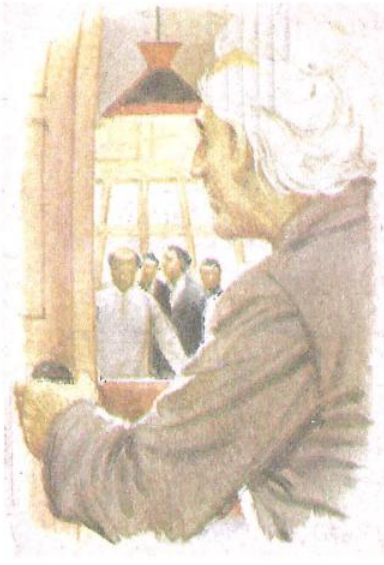

ক্যাপসুল। প্রত্যেকটার জন্যে আলাদা সুইচও আছে, আবার একটা মেন্ সুইচও আছে। সবগুলো একসঙ্গে কাজ করলে রোবটটা একটা সাধারণ মানুষের মতোই ব্যবহার করে।"

একটু থেমে সাত্যকিবাবু আবার বললেন, "এইসব মানসিক প্রবৃত্তির ক্যাপসুল কিসের থেকে তৈরি করেছি জানেন? নানারকম জীবজন্তুর রক্ত নিয়ে। যেমন, শেয়ালের দেহ থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে ভয় আর চুরির প্রবৃত্তির ক্যাপসুলটা তৈরি করেছি। যাতে অন্য ক্যাপসুলের সঙ্গে গুলিয়ে না যায়, তার জন্যে ঐ ক্যাপসুল আর সুইচের ওপর ছোট্ট করে 'ভ-চু' অক্ষর দুটো লেখা আছে। ঠিক তেমনি বনশুয়োরের রক্ত থেকে 'গোঁ', কুকুরের রক্ত থেকে 'বিশ্বাস আর দাসত্ব' বা 'বি-দা'—এইসব ক্যাপসুল করেছি। ইচ্ছে করলে একেকটা সুইচ বন্ধ রেখে আমি নরোত্তমকে একেক রকম মেজাজে আনি। ও, বলতে ভুলে গেছি, আমার রোবটের নাম নরোত্তম। কাজের অবসরে কিছু গল্পগুজব করে মাথাটাকে হাল্কা করে নেওয়ার জন্যেই একজন সাধারণ আর স্বাভাবিক মানুষের মতন নরোত্তমকে সৃষ্টি করেছি। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, সে তো আমি যে-কোনো বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত জনের সঙ্গে গল্প করেও আনন্দ পেতে পারি। না। দেখেছি, তাঁরা আমার সুবিধামতো সময়ে আসেন না। বরং আমি যখন ব্যস্ত, তখন এসে তাঁরা অসুবিধারই সৃষ্টি করেন। তাছাড়া ..." সাত্যকি সোম ছোট্ট একটু হেসে বললেন, "নরোত্তম আমার দরকারমতো থামতে বা বিদায় নিতেও পারে। তা আপনারা একদিন দেখে আসবেন ওকে।"

আমরা একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, "অবশ্যই, অবশ্যই!"

দ্বৈপায়নবাবু দুলে-দুলে বলেই চললেন। জানি না, এক গোগুল 'অবশ্যই' বলে থামবেন কিনা। তার আগেই সাত্যকি সোম উঠে পড়ে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

এবার আড্ডায় 'পারস্পরিক সম্পর্ক' বিষয়ে আলোচনা হবে। প্রথমেই আমি উচ্চকণ্ঠে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললাম, "বুড়োর এবার মাথা খারাপ হয়েছে। নইলে, খেয়েদেয়ে কাজ নেই, একটা মানুষের মতন নিষ্কর্মা রোবট তৈরি করেছে! কী, না তাকে হাসাই, কাঁদাই, রাগাই, ভয় দেখাই। গবেষণা-টবেষণা সব চুলোয় গিয়েছে বোধহয়।"

উপগুপ্ত মল্লিক হেসে বললেন, "দ্যাখো, আসলে রোবটই কি না।

সাতু-বুড়ো হয়তো যন্ত্রের ভেতরে কোনো মানুষকেই ভরে রেখেছে।"

আমি এবার টেবিলে ঘুসি মেরে বললাম, "যদি সত্যিই খামখেয়ালি করে এরকম একটা অকর্মণ্য রোবট তৈরি করে থাকে বুড়ো, তবে সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপচয়।এসব লোককে ধরে ..."

কথা শেষ হল না। দেখি, দরজার মুখে সাত্যকি সোম। আমার মুখের রক্ত যে সরে যাচ্ছে, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। সাত্যকি সোমের মুখে কিন্তু সেই একইরকম মৃদু হাসি। তিনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন ? তাঁর আচরণে কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। সবাইকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন,"দয়া করে যাওয়ার আগে একবার টেলিফোনে করবেন। নরোত্তমই বলে দেবে, কোন সময়ে গেলে আমার সুবিধে। নমস্কার।"

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ধৃতরাষ্ট্র মণ্ডল দেখলেন, সাত্যকি সোম পার্কের বাইরে চলে যাচ্ছেন। দেখার পর নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বললেন, "তাহলে যাচ্ছেন কবে আপনারা নরোত্তম মহাশয়কে দর্শন করতে ?"

প্রায় একসঙ্গেই সবাই বলে উঠলেন, "খেপেছেন ! যেরকম শুয়োর আর শেয়ালের কথা শুনলাম, গুঁতিয়ে বা কামড়ে দিলেই গেছি।"

আমি কোনো কথা বললাম না। যে লজ্জা আর অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম, সেটা আমার তখনও কাটেনি।

পরদিন ভাবলাম, দেখেই আসি না একবার সাত্যকি সোমের রোবটকে। ডক্টর সোম যেরকম আত্মভোলা লোক, তাতে হয়তো আমার কথাগুলো শুনে থাকলেও মনে রাখেননি। তা ছাড়া শনিচক্রের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র আমিই তাঁর রোবটকে দেখতে যাচ্ছি, এতে হয়তো আমার ওপর খুশিও হতে পারেন।

টেলিফোন করতেই নরোত্তম ধরল। বোতাম টিপে ফোনোভিশানের পর্দায় তার মুখটাও দেখতে পেলাম। ধাতুর তৈরি হলেও সুশ্রী। অন্যসব রোবটের মতন কাঠখোট্টা নয়। মুখমণ্ডলটা বোধহয় সাত্যকিবাবু তাঁর বাল্যবন্ধু ভাস্কর অগ্নিদেব চৌধুরীকে দিয়েই তৈরি করিয়েছেন। নরোত্তম কথাবার্তাতেও চৌখস। আমার মাথার চকচকে টাক আর মাথার পিছনের পাকা চুল বোধহয় সেও তার ফোনোভিশানে দেখে নিয়েছিল। বলল, "চলে আসুন না দাদু এখনই। সার্ এখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। তারপরে আমাকে নিয়ে পড়বেন কিছুক্ষণ। কাজেই আপনিও চলে আসুন। এক ঢিলে ... এক

ঢিলে এক ঢিলে "

আমি বললাম, "এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে, এই বলছ তো ?"

নরোত্তম হেসে বলল, "ঠিক তাই। আমার মাথায় প্রবাদ ডিভাইস্ ইউনিটের কানেকশনটা মাঝে-মাঝে আলগা হয়ে যায়, বুঝেছেন ? সারকে বলব ভাবি, কিন্তু ভুলে যাই। ভুলের ক্যাপসুলটা বড় জোরদার করেছেন আমার। কিসের রক্ত দিয়ে কে জানে ! হয়তো রামছাগলের।"

নরোত্তম চুপ করল। আমি দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সাড়া পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে নরোত্তম শুধু বলল, "এখন আর কোনো কথা নয়। আবার আপনি এলে।"

বেরোচ্ছি বেরোচ্ছি করেও সাত্যকিবাবুর বাড়ি যেতে একটু দেরি হয়ে গেল। ঠিক সময়ে কোথাও যাওয়া আমার ধাতে নেই। গিয়ে দেখলাম, সাত্যকিবাবু বৈঠকখানার ঘরে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। এক কোণে নরোত্তম একেবারে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে। মেন সুইচ অফ করা ছিল।

সাত্যকিবাবু আমাকে রোবটের কাছে নিয়ে গিয়ে তার মাথার দিকে তাকাতে বললেন। সারা মাথায় মোটা মোটা শজারু-কাঁটার মতন চুল বলে দূর থেকে যেগুলোকে ভেবেছিলাম, সেগুলোই যে নানারকম স্বভাবের ক্যাপসুল, সেটা এবার কাছ থেকে বুঝতে পারলাম। প্রত্যেকটার গায়ে ছোট ছোট অক্ষরে কী সব লেখা। যেমন, একটার ওপর দেখলাম, 'অধ্য' শব্দটা লেখা আছে। সাত্যকিবাবু বুঝিয়ে দিলেন, "এটার অর্থ অধ্যবসায়। মৌমাছির রক্ত বা রস নিয়ে এটার ক্যাপসুল তৈরি।"

মানুষের রক্ত দিয়ে কোনো ক্যাপসুল করা হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করতে সাত্যকিবাবু বললেন, "না, একই শ্রেণীর জন্তু পাখি বা কীট একই রকম ব্যবহার করে। মানুষের বেলায় তো এটা হয় না। যে-লোকটা চুরি করে, সে হয়তো কোথাও দানও করে থাকে। তাই কোনো মানুষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হয়ে তার রক্ত কাজে লাগাই কী করে ?"

এরপর তিনি মেন সুইচটা অন্ করে দিলেন। পাছে নরোত্তম অতিথিকে কোনো কিছু অসম্মানজনক কথা বলে, সেজন্যে রাগের সুইচটা বুদ্ধি করে আগেভাগেই অফ্ করে রাখলেন সাত্যকি সোম।

মুহূর্তে রোবটটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। সে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু ফোনোভিশানে তার যে হাসিখুশি মুখ দেখেছিলাম, এটা যেন সেরকম নয়। বরং তার দৃষ্টিতে বুঝি মিশে ছিল একটু বিরক্তি আর অপ্রসন্নতা।

সাত্যকি সোমকে বললাম, "আমি এসে হয়তো আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। আপনার মতন একজন "

সাত্যকি সোম স্বভাবসুলভ ভদ্রতায় বোধহয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই নরোত্তম মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, "সেটা যখন জানেনই, তখন ন্যাকামি করে আরও সময় নষ্ট করছেন কেন ? কেটে পড়ুন না। সার এখন কাজে বসবেন। যখন আসতে বলেছিলাম, তখনই এলেন না কেন ? মহাকাজ ছিল ?"

আর কিছু বলার আগেই সাত্যকি সোমের কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল, "নরোত্তম ! চুপ কর ! তোর সুইচ এখনই অফ্ করে দিচ্ছি।"

বলার সঙ্গে -সঙ্গে ম্যাজিকের মতন

ফল হল। তার মাথার 'ভ-চু' ক্যাপসুলের মধ্যে ছোট্ট একটা আলো জ্বলে উঠে কাঁপতে কাঁপতে আবার নিভে গেল। নরোত্তমের কণ্ঠও কেঁপে উঠল। সে বলল, "ক্ষমা করুন সার্। আমার মাথার ম-এ-মু-আ ক্যাপসুলটা বোধহয় খুলে গিয়েছে।"

"সে কী!" বলে সাত্যকি সোম লাফ দিয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি মেন সুইচটা অফ করে দিলেন নরোত্তমের আপত্তি সত্ত্বেও। তারপর রোবটের কাছে গিয়ে দেখলেন, সত্যিই একটা ক্যাপসুল ভেঙে মেঝের ওপর পড়ে আছে। ওপরে লেবেল আঁটা 'ম-এ-মু-আ'।

ভাঙা ক্যাপসুলটা হাতে নিয়ে সাত্যকিবাবু আমার পাশে তাঁর চেয়ারে এসে আবার বসলেন। বললেন, "এটা হল ভদ্রতার ক্যাপসুল। এটা তৈরি করেছিলাম বেড়ালের এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে। আমার বেড়ালের নাম কাবলি। আমার খাওয়ার সময় সে পাশে এমনভাবে চোখ বুজে বসে থাকে, যেন হরিনাম জপ করছে। আসলে যে তার মাথায় খেলছে চুরির মতলব, সেটা বোঝা যায় আমি একটু অন্যদিকে তাকালেই। ম্যাজিকের মতন দেখি আমার পাতের মাছ কাবলির মুখে। তখনই ভাবলাম, এত ভদ্র বেড়াল যখন, ওর রক্ত দিয়ে এই ম-এ-মু-আ ক্যাপসুলটা করা যাক।" বলে এবার একটু শব্দ করেই হাসলেন সাত্যকি সোম।

আমার কান লাল হয়ে উঠেছিল নরোত্তমের কথায়। সেদিনকার শনিচক্রে আমার নিজের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। নরোত্তম সামনাসামনি বলল, আর আমি আড়ালে বলতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম। তাই সাত্যকি সোম যখন বোঝালেন যে, ভদ্রতার ক্যাপসুলটা ভেঙে যাওয়াতে আমার যে অসম্মান হল, তাতে তিনি কতখানি লজ্জিত আর মর্মাহত, তখন আমাকে কেঠো হাসি হেসে বলতে হল, "না, না। এতে মনে করার কী আছে? নরোত্তম একটা যন্ত্র বই তো কিছু না—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ড্রয়ার থেকে একটা তরল পদার্থভরা ক্যাপসুল বের করে সাত্যকিবাবু বললেন, "বিদুরবাবু, আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তবে আমার উপকার হয়। আপনার আঙুলে সুঁচ ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত নেব আমি। সেটা এই ক্যাপসুলের তরল পদার্থে মিশিয়ে নরোত্তমের মাথার মুডো-ইনভারটার খোপে এঁটে দেব। দেখবেন, ও আবার কেমন ভদ্র হয়ে যায়। যে-কোনো লোকের রক্ত তো নিতে পারি না। আপনার ভদ্রতার পরিচয় পেয়েছি, তাই নিশ্চিন্তে নিতে পারি। সাত্যকিবাবুর কথায় এতটা খুশি হলাম যে, মনে হল, তিনি যদি এক বোতল রক্ত চান, তাও বোধহয় দিতে পারি। কিন্তু তিনি এক ফোঁটা রক্তই নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপসুল প্রস্তুত হয়ে গেল। এবার ছিপের ফাতনার মতন ক্যাপসুলটাকে মাথায় গুঁজে দেওয়ার অপেক্ষা।

সাত্যকি সোম কিন্তু তার আগেই ভুল করে রোবটের মেন সুইচটা অন্ করে দিলেন। নরোত্তম আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। সাত্যকি সোম ক্যাপসুলটা নিয়ে এগোতে এগোতে বললেন, "দাঁড়া নরোত্তম। ভদ্রতার ক্যাপসুলটা রেডি করেছি। বিদুরবাবুর মতন তোকেও একজন ভদ্রসভ্য ব্যক্তি হতে হবে।"

নরোত্তম হেসে উঠল, "ওর রক্ত নিয়েছেন বুঝি, সার্? তবে ম-এ-মু-আ

ক্যাপসুলটাকে মিছিমিছি ভদ্রতার ক্যাপসুল কেন বলছেন ? নামটা বলেই দিন না—মনে এক মুখে আর। বিদুরবাবুরও বুঝি তাই ?"

আরও কিছু বলার আগেই অপদস্থ সাত্যকি সোম ছুটে গিয়ে ক্যাপসুলটা রোবটের মাথায় লাগিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে আমার কান শুধু নয়, সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছে অপমানে। মনে হল, রোবটকে দিয়ে সাত্যকি সোম ইচ্ছে করেই আমাকে অপমান করালেন। আমারই রক্ত দিয়ে ক্যাপসুল তৈরি করে সেদিনকার শনিচক্রের ঘটনার প্রতিশোধ নিলেন তিনি।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। সাত্যকিবাবু কোনো বাধা না দিয়ে অন্যদিকে ফিরে রইলেন মাথা নিচু করে। কতই যেন লজ্জা পেয়েছেন, এমন ভান করলেন। রাগে গা জ্বলে গেল।

অবশ্য নরোত্তমের মাথায় ক্যাপসুলটা তখন লাগানো হয়ে গিয়েছিল। ঘরের বাইরে পা ফেলতেই শুনলাম নরোত্তমের কণ্ঠস্বর, "চললেন নাকি দাদু ? একটু চা খাবেন না ? অবিশ্যি এত বেলায় চা না খেয়েই কি বেরিয়েছেন ? বড়ই আনন্দ পেলাম। আরেকদিন আসবেন।"

কয়েক পা সিঁড়ি নামতেই নরোত্তমের উচ্চকণ্ঠের হাসি শুনলাম। তারপর সে বলে উঠল (বোঝাই গেল সাত্যকি সোমকে বলছে), "রাগছেন কেন সার্ ? ঠিকই করেছি। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা ··· বাঘা ··· বাঘা···"

প্রবাদ ডিভাইস ইউনিটের কানেকশনটা আবার বোধহয় ফেল করতে শুরু করল।

ছবি : বিমল দাস

আদর্শ ভোজন

গৌরী মিত্র

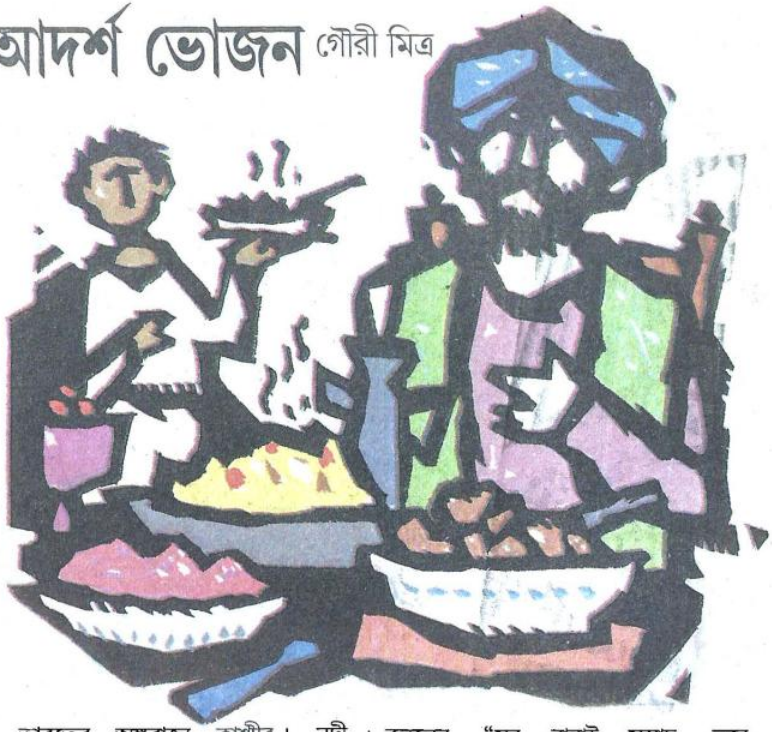

ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর। নদী, পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ, গাছপালা সব নিয়ে যে মনোরম কাশ্মীর তাকে লোকে বলে ভূস্বর্গ। এই ভূস্বর্গেই বাস করেন এক ধনী ব্যবসায়ী। দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা। পাঞ্জাব থেকে সেবার তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এলেন। দুজনে দুজনকে অনেকদিন পর দেখে আনন্দে আত্মহারা।

বন্ধুর আদর-যত্নের যাতে কোনোরকম ত্রুটি না হয় সেজন্য কাশ্মীরি-বন্ধু খুব তৎপর হয়ে উঠলেন। রসুইখানায় তিনি নানারকম মুখরোচক কাশ্মীরি-খানা বানাবার নির্দেশ দিলেন। প্রথম দিনে রকমারি সব খাবার-টাবার দেখে পাঞ্জাবি-বন্ধু তো অবাক। তৃপ্তি করে সব খেয়ে-টেয়ে তিনি বললেন, "সব রান্নাই সুস্বাদু, তবে কোনোটাই আমাদের পাঞ্জাবি-খানার স্বাদকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।"

কথাটা শুনে কাশ্মীরি-বন্ধুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরদিন তিনি এক জমকালো ভোজের আয়োজন করলেন। বিয়েবাড়ির ভোজকেও সে ভোজ হার মানায়।

খাবার টেবিলে সাজানো হল থরে থরে সব ডিশ। তাতে আছে মুখরোচক খাবার-দাবার। দই দিয়ে তৈরি মাংস, কোফ্‌তা, মাংসের পিঠে, তাতে ভুরভুর করছে পুদিনাপাতার সুগন্ধ। মাংসের রোগান জুস। জাফরান দিয়ে রান্না পোলাও। মাংসের কাবাব তো আছেই। আছে বাহারি সুস্বাদু ফল আর মিষ্টি। সে এক এলাহি ভোজ।

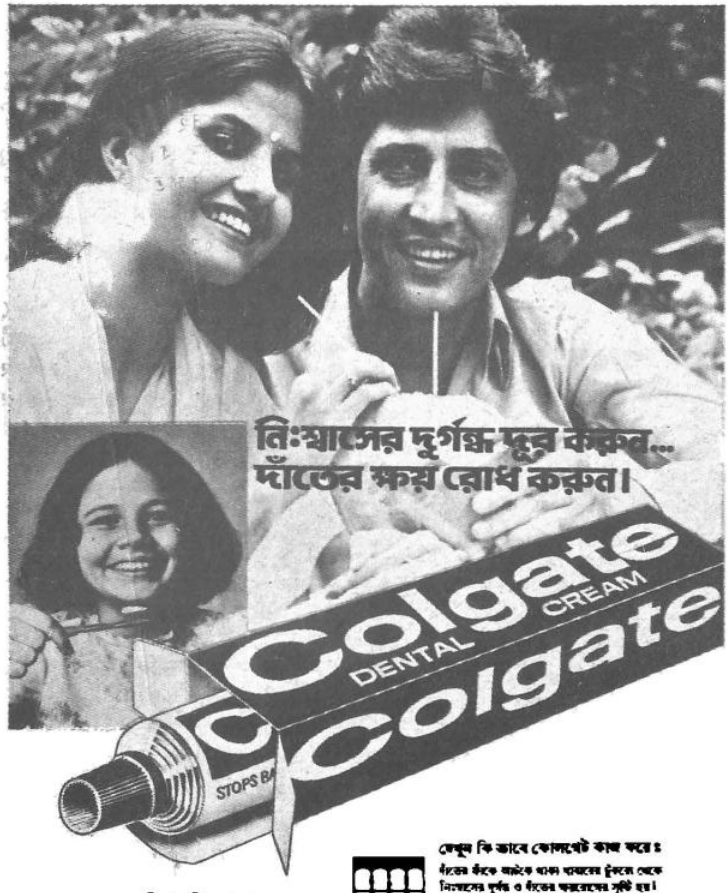

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন।
Colgate
DENTAL CREAM
Colgate
STOPS BA
দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে ঃ
দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়।
কোলগেটের অগণিত ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই সব ক্ষতিকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূর করে, দাঁতকে পরিষ্কার, ঝকঝকে রাখে।
ফলাফল ঃ তাজা, নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্ষয় থেকে সুরক্ষা আর সুস্থ-সবল দাঁত।
প্রতিবার দাঁত মাজার সময় কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে রাখে তাজা, নির্মল··· দাঁতকে রাখে শক্ত-মজবুত, সুস্থ-সবল।
প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন ... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
এর অতুল মিষ্টি স্বাদ... সত্যিই চমৎকার!

GK&E.B82.88 BN

পাঞ্জাবি বন্ধু খাচ্ছেন। কাশ্মীরি-বন্ধুটি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আজ নিশ্চয়ই বন্ধু বলবেন, "এমন সব সুখাদ্য জীবনেও খাইনি।" খাওয়া শেষ হল। পাঞ্জাবি বন্ধু তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন। হাত-মুখ ধুলেন। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "এ রাজকীয় ভোজ সন্দেহ নেই, কিন্তু পাঞ্জাবি-খানার স্বাদ এর তুলনায় অনেক ভাল।"

এবার কাশ্মীরি-বন্ধুর মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। পরদিন তিনি এক সেরা ভোজ, যাকে বলে "কাশ্মীরি ভোজ" তার ব্যবস্থা করলেন। শহরের সেরা হালুইকরদের ডেকে পাঠালেন। বাজারের সেরা ফল, মিষ্টি, মাংস, মশলা আনলেন। সারাদিন রসুইশালে রান্নার ছ্যাঁক ছোঁক আওয়াজ হতে লাগল। বাড়ি গন্ধে ম-ম করতে লাগল। যথারীতি সন্ধেবেলা বন্ধুকে নিয়ে কাশ্মীরি ধনী ব্যক্তিটি খেতে বসলেন।

পাঞ্জাবি-বন্ধু তো আজ সব খেয়ে শেষ করেই উঠতে পারছেন না। কত রকমের কত যে পদ, কত যে মিষ্টি কত যে ফল তা গুনে শেষ করা যায় না। খাওয়া শেষ হতে পাঞ্জাবি মানুষটির আজ যথেষ্ট সময় লাগল। তিনি খেয়ে উঠে হাত ধুয়ে ভুরভুরে সুগন্ধ দেওয়া মশলাপান মুখে পুরলেন আর বললেন, "এত সব খাবার জীবনেও খাইনি, তবে আমার মুখে এখনও আমার দেশি রান্নার স্বাদটা লেগে আছে বলেই হয়তো এসবে তেমন স্বাদ পেলাম না।"

এর পরদিন পাঞ্জাবি-বন্ধুটি দেশে ফিরে গেলেন। বন্ধুকে তাঁর দেশে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে যেতেও ভুললেন না। কাশ্মীরি-বন্ধুর মনটা খারাপ। এত করেও তিনি বন্ধুকে খুশি করতে পারেননি। মনে মনে ইচ্ছে রইল পাঞ্জাবে গিয়ে একবার সেই আচ্ছা খানা খাবেন। না জানি তার স্বাদ কী রকম।

শীত এল। কাশ্মীরের নদী-নালার জল জমে বরফ হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কাশ্মীর ছেড়ে এবার সেই ধনী ব্যক্তিটি চললেন পাঞ্জাবে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর বাড়িতে সবাই তাঁকে স্বাগত জানালেন। বন্ধুও খুশি। তিনি কিন্তু মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠছেন। ভাবছেন কখন সেই সুস্বাদু পাঞ্জাবি-খানা খাবেন।

খাবার সময় হল। দুই হাতে দুটি প্লেট এনে টেবিলে রাখল ভৃত্য। তার একটিতে করা রয়েছে গোটা চারেক চাপাটি আর একটাতে কিছু রান্না করা সবজি। ভৃত্য আর একবার এসে এক কাপ টক দই রেখে গেল। তারপর পাঞ্জাবি বন্ধুটি বললেন, "নাও বন্ধু, এবার খাওয়া শুরু করো।" কাশ্মীরি-বন্ধু ভাবলেন পরের দিন বোধহয় তাঁর বন্ধু তাঁকে সেই মুখরোচক পাঞ্জাবি-খানায় আপ্যায়িত করবেন।

ওমা! পরের দিনও সেই একই ব্যাপার। চাপাটি, সবজি আর দই। দু-চার দিন দেখে একদিন আর না থাকতে পেরে তিনি বলে ফেললেন, "বন্ধু, কাশ্মীরে যখন তুমি গিয়েছিলে, তখন তুমি রোজই বলতে তোমাদের দেশি খানার মতো সুস্বাদু খানা আর নেই। কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের দেশে কোনও সুস্বাদু খাবার জিনিসই নেই।"

পাঞ্জাবি বন্ধুটি একথা শুনে হো হো করে হেসে বললেন, "বন্ধু, তুমি আমার কথার অর্থ আসলে বুঝতেই পারনি। আমি বলতে চেয়েছি যে আমরা সরল, সাধারণ, সহজপাচ্য খাদ্য খাই। তোমাদের মতো গুরুপাক খাবার-দাবার আমরা খাই না। সহজপাচ্য সব খাবার শুধু উপাদেয়ই নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।" কথাগুলো শুনে কাশ্মীরি-বন্ধুটির চোখ ফুটল।

ছবি : দেবাশিস দেব

যাঁরা আপন

উৎপল চৌধুরী

স্নেহাশিস মাসিমার
পিসির আদর
হাড়কাঁপা শীতে যেন
পশম-চাদর।

কাকিমার শাসনেতে
জ্যেঠিমা যে ত্রাতা
কাকিমা বৃষ্টি যদি
জ্যেঠি তবে ছাতা।

দিদিমার পিছটান
মামিমার যত্ন
এ কি শুধু ভালবাসা—
এ অরূপ রত্ন!

ঠাকুমার প্রশ্রয়
মা'র তর্জনী
ঠা-ঠা রোদে ছায়া যেন
ঠাম্মা-মামণি।

ভুতুড়ে

রথীন্দ্রনাথ রায়

তেঁতুলগাছে ভূতে ঝোলায়
পা রে!
লম্বা দুটো রাখবে পা কার
ঘাড়ে?
ভূতের ভয়ে তেঁতুল কি কেউ
পাড়ে?

তেঁতুলগাছে তেঁতুলভূতের
বাড়ি,
ভুলেও পথে যায় না পথ-
চারী।
পর পর পর তেঁতুলগাছের
সারি।

তেঁতুলগাছে তেঁতুলভূতরা
থাকে,
মুখ লুকিয়ে ডাল ও পাতার
ফাঁকে।
যায় না পাড়া তেঁতুল যখন
পাকে!

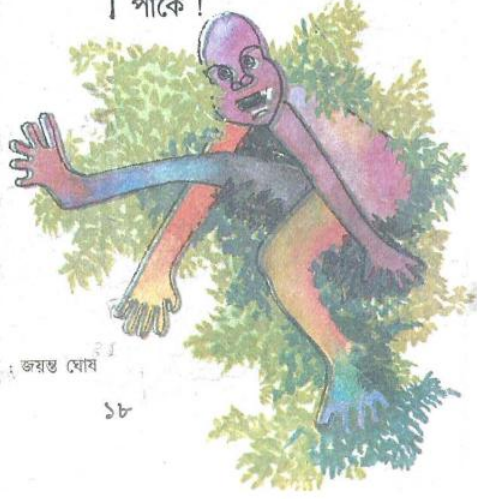

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ওর দিদি ইরানি বর্ধমানের এক গ্রামে এসেছে ওদের জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ নিতে। জ্যাঠামশাই গ্রামে একাই থাকেন। আসবার পথেই দিপু আর ইরানি জানতে পারল যে, জ্যাঠামশাইকে তিনদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাইয়ের একজন সহকারীর নাম মধু, সে জানাল যে, জ্যাঠামশাই একদিন সন্ধেবেলা পুকুরঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয় ঘরের মধ্যে বিছানায়। পরদিন সকালে তাঁকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে মাঝরাত্তিরে তিনি নাকি একবার লেবুবাগানে গিয়েছিলেন। তারপর...

॥ ৭ ॥

একটু আগেই রোদ ঝকঝক করছিল, হঠাৎ আকাশটা কালো হয়ে এল আর ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সুতরাং বাকি রাস্তাটুকু ওদের ছুটে আসতে হল।

বাগানের মধ্যে ছোট্ট একটা বাংলো-বাড়ি। সিমেন্টের মেঝে, আর দেয়াল, ওপরে কিন্তু খড়। খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এই বাড়ির বারান্দা থেকেই ডানদিকের পেয়ারাবাগানটা দেখতে পাওয়া যায়। সব গাছই পোড়া-পোড়া, যেন খুব আগুন লেগেছিল। বাজ পড়েছিল ওখানেই। দিপু ভাবল, বাজ পড়ায় যদি ওরকম ভাবে গাছ পুড়ে যায়, তাহলে ওখানে তখন কোনো মানুষ থাকলে সে নিশ্চয়ই পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেত!

দৌড়ে আসবার সময় ওরা বেশি ভেজেনি, কিন্তু ইরানি সব সময় ফিটফাট থাকতে ভালবাসে। সে জিজ্ঞেস করল, "বাথরুমটা কোথায়?"

কলকাতার মতন এখানকার বাড়িতে শোবার ঘরের পাশেই বাথরুম থাকে না। বাথরুমটা একটু দূরে, উঠোন পেরিয়ে, লেবুবাগানের পাশে, বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া মুশকিল। রঘুরই বয়েসী একটা ছেলে থাকে এখানে, তার নাম কেষ্ট। সে বলল, "চলুন দিদি, আমি আপনাকে ছাতা ধরে নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্যাগ থেকে তোয়ালে বার করে ইরানি চলে গেল কেষ্টর সঙ্গে।

মধু বলল, "তোমরা দাদারা খেয়ে আসোনি তো? বেলা হয়ে গেছে অনেক। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয়।"

রঘু বলল, "হ্যাঁ, বেশ খিদে পেয়েছে। খিচুড়ি বসিয়ে দিন না। যদি বলেন তো আমিও রান্নার যোগাড় করতে পারি।"

মধু বলল, "না, রান্নার লোক আছে।" তারপরই সে হাঁক পাড়ল, "এককড়ি, ও এককড়ি, একবার ইদিকে এসো তো!"

দিপু এর মধ্যে একবার জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরটা ঘুরে দেখে এসেছে। সে ঘরে জিনিসপত্র প্রায় কিছুই

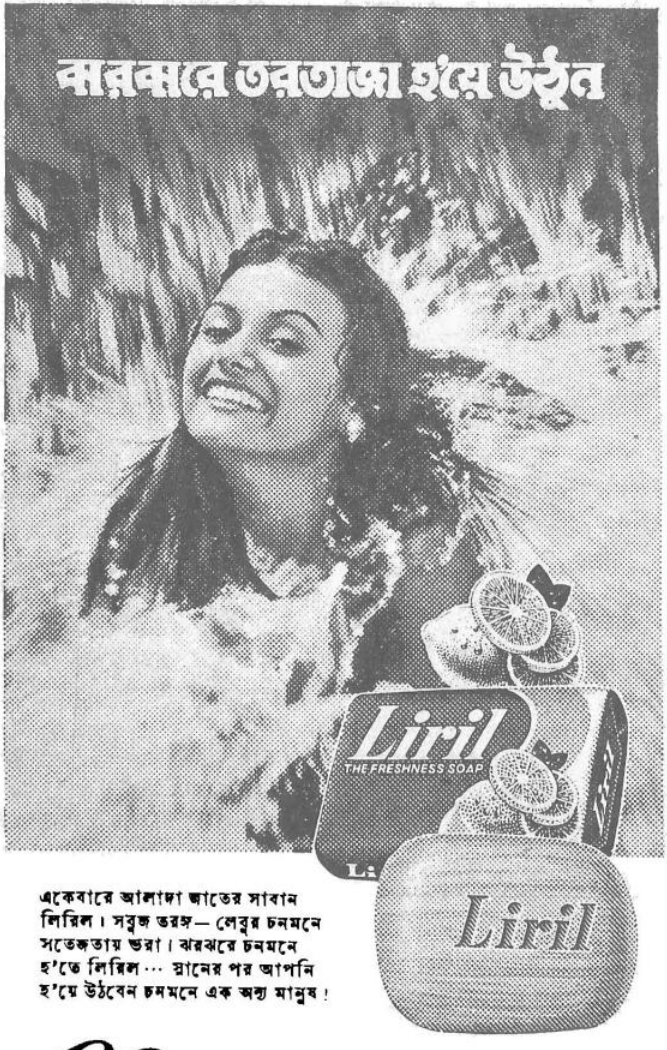

একেবারে আলাদা জাতের সাবান
লিরিল। সবুজ তরঙ্গ— লেবুর চনমনে
সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে
হ'তে লিরিল ··· স্নানের পর আপনি
হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিনটাস - LR.27.1810

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

নেই। শুধু একটা খাট আর একটা জামা-কাপড়ের আলনা। কোনো আলমারি, বা বাক্স-টাক্স কিচ্ছু নেই। জ্যাঠামশাই টাকা-পয়সা রাখতেন কোথায় ? কিংবা দরকারি কাগজপত্তর ?

দিপু জিজ্ঞেস করল, "আপনারা এখানে ক'জন আছেন ?"

মধু বলল, "এই তো আমি আছি। আমিই সব দেখাশুনো করি। আর কেষ্ট খুচরো কাজকর্ম করে, এককড়ি রান্নাবান্নার দিকটা দেখে। আর মাঝে-মাঝে কিছু ঠিকে-লোক রাখা হয়। এখানে থাকি আমরা এই তিনজনই। কোনোদিন কোনো গণ্ডগোল হয়নি।"

"কে যেন বলল, কয়েকদিন আগে এখান থেকে একটা সাইকেল চুরি হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ, সাইকেলটা পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো ছেলেপিলে দুষ্টামি করে নিয়ে গেছে মনে হয়। আমাদের বাগানের জিনিস কেউ চুরি করে না। বড়বাবু অতি ভালমানুষ ছিলেন।"

দিপু গম্ভীরভাবে মুখ নিচু করে রইল। তদন্ত করার সময় ডিটেকটিভরা যে-রকম ভাবে প্রশ্ন করে সে সেইরকম এলোমেলো কিছু প্রশ্ন চিন্তা করতে লাগল। এমন কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, যার উত্তর এরা আগে থেকে ভেবে রাখেনি।

কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই এককড়ি এসে হাজির। তাকে দেখে দিপু অবাক। রান্নার ঠাকুর কোথায়, এ যে একজন সাধুবাবা ! মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, গেরুয়া কাপড় আর চাদর গায়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বেশ বুড়ো

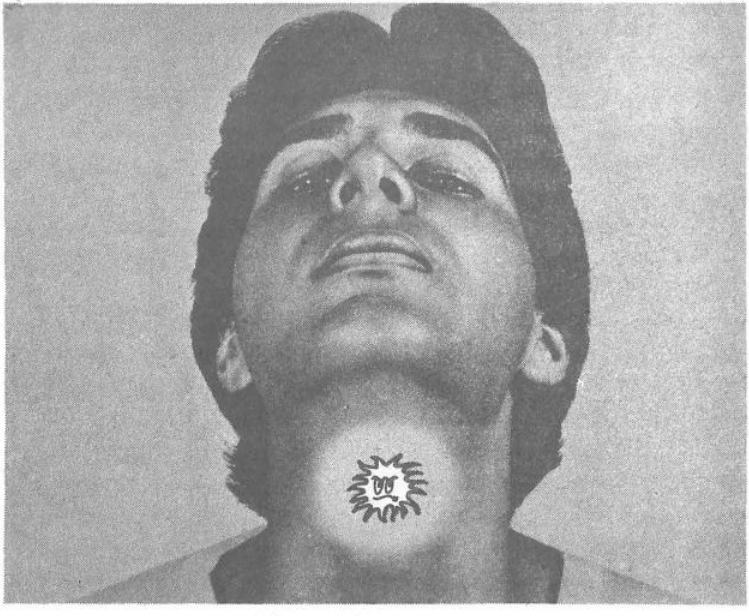

গলার 'খিচখিচ' দূর করুন

'খিচখিচ' কি ?

যখনই আপনার গলা খুশখুশ করবে, অথবা গলা শুকিয়ে যাবে —তখনই বুঝবেন যে আপনার গলায় 'খিচখিচ' এসেছে।

ভিক্স নিয়ে নিন 'খিচখিচ' দূর করুন

ভিক্স নিয়ে নিন
ভিক্স কাশির বড়িতে গলায় আরামদায়ক ৬ টি ভিন্নের ঔষধি আছে, যা 'খিচখিচ' দূর করে।
তার জন্য যখনই গলায় 'খিচখিচ' আসবে, ভিক্স নিয়ে নিন।

ভিক্স নিয়ে নিন!

মতন, মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব।

দিপুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইটি কে ?"

মধু বলল, "বড়বাবুর ভাইপো-ভাইঝি এসেছেন। আমি আজই কলকাতায় চিঠি পাঠালুম। যাই হোক, এনারা কিছু খেয়ে আসেননি, খুব তাড়াতাড়ি কিছু বানিয়ে দাও। খিচুড়ি যদি হয়, আলু-বেগুন তো আছেই।"

এককড়ি রান্নার কথায় পাত্তা না দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "গতিক মোটেই সুবিধের নয়! এসব কী শুরু হয়েছে ? খুব খারাপ! খুব খারাপ!"

মধু বলল, "আবার কী হল ?"

এককড়ি বলল, "চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছ না ? এ কী অলুক্ষুনে বৃষ্টি ? এই সময় কি কখনো বৃষ্টি হয় ? আর দ্যাখো না, আমাদের এখানেই বৃষ্টি, আর দূরের মাঠ শুকনো খটখটে।"

মধু বিরক্ত ভাবে বলল, "এরকম বৃষ্টি কি নতুন দেখছ ? শেয়াল-কুকুরের বিয়ে কখন হয় জানো না ?"

এককড়ি বলল, "আসল কথাটা কী জানো ? তোমরা বুঝবে না। কিন্তু আমি ঠিক বুঝেছি। বড়বাবুকে আসলে ওরা ভুল করে ধরে নিয়ে গেছে। ওরা আমাকে ধরতে এসেছিল। আমি ঠিক জানি!"

দিপু এবার জিজ্ঞেস করল, "ওরা মানে কারা ?"

এককড়ি বলল, "সে তোমরা বুঝবে না ? তোমরা বুঝবে না!"

আবার সে বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল উঠোনে।

মধু নিজের মাথার কাছে আঙুল ঘুরিয়ে এককড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "ওর মাথার গোলমাল আছে। কী যে কখন বলে, তার মানে বোঝা যায় না। তবে লোকটা বড়ো ভাল!"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "উনি কি সাধু ?"

মধু বলল, "কে জানে! সাধুর মতন জামা-কাপড় পরলেই কি আর লোকে সাধু হয় ? শক্তিগড়ের-হাটে বড়বাবুর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে বড়বাবু ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেই থেকে রয়ে গেছে।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এখানে কারুর ঝগড়া হয়েছিল ?"

মধু জিভ কেটে বলল, "না না না! বড়বাবু একেবারে মাটির মানুষ, এদিকের সব লোক তাঁকে ভালবাসে। এমন-কি কেউ কেউ তাঁকে ঠকাতে গেলেও তিনি রাগ করতেন না। হাসিমুখে বলতেন, ওরে, যে অন্যকে ঠকাতে যায়, সে নিজেই বেশি ঠকে।"

দিপু কপাল কুঁচকে রইল। সমস্ত রহস্য-কাহিনীতেই সে পড়েছে যে, প্রত্যেক অপরাধের পেছনেই একটা মোটিভ থাকে। জ্যাঠামশাইকে যদি কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার মতলব কী হতে পারে ? জ্যাঠামশাইকে আটকে রেখে তারপর মুক্তিপণ চাইবে ? এইরকম কারণে ডাকাতরা সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েদেরই ধরে নিয়ে যায়, এরকম একজন বয়স্ক মানুষকে তো নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যায় না।

ইরানি ফিরে এসে বলল, "যা দিপু, তুইও মুখ-হাত ধুয়ে আয়। মুখখানা তো ধুলোতে কালো হয়ে গেছে।"

তারপরই সে মধুর দিকে ফিরে বলল, "লেবুবাগানে কয়েকটা গাছ কে উপড়ে ফেলেছে ?"

মধু চমকে গিয়ে বলল, "গাছ উপড়ে ফেলেছে ? সে কী ? না, না, ওসব গাছ

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

তফাৎটা সহজেই প্রমাণ করতে পারেন। সুপার রিনে ধোয়া কাপড় অন্য যেকোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ধবধবে সাদা হয়, কারণ সুপার রিনে আছে শুভ্রতা আনার বেশী শক্তি! আপনার জামাকাপড় এমন সাদা করে, যা সবার নজরে পড়ে।

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS.RIN.54.2027.BG

তো খুব দামি।"

ইরানি বলল, "আমি যে এইমাত্র দেখে এলাম। চার-পাঁচটা গাছ কারা যেন তুলে ফেলেছে। আজকেই তুলেছে মনে হল!"

মধু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে?"

কেষ্ট বলল, "আমিও তো তাই দেখলুম। কেউ মাটি খুঁড়েছে, গাছগুলো তুলে গর্ত করেছে।"

মধু বলল, "আমি গাঁয়ে গিয়েছিলুম, তুই তো ছিলি এখানে, কে এসে গাছ উপড়ে ফেলল, তুই দেখলি না?"

কেষ্ট বলল, "কী করে দেখব? দিনের বেলা কি এসেছে নাকি? নিশ্চয় রাত্তিরের অন্ধকারে কেউ এসেছিল।"

মধু বলল, "রাত্তিরে কেউ এসে নেবুগাছ কেটে ফেলবে কেন? গাছে তো এখন নেবু নেই। সব পাড়া হয়ে গেছে!"

কেষ্ট বলল, "বড়বাবু নেবুবাগানে মাঝরাত্তিরে গেসলেন কেন, সেটা ভাবো আগে!"

ইরানি বলল, "এটা ঠিক বলেছে! জ্যাঠামশাই মাঝরাত্তিরে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তারপর কাল রাত্তিরে আবার কেউ এসেছিল ওখানে। কিছু খোঁজাখুঁজি করতে নিশ্চয়ই। কী আছে ওখানে!"

মধু বলল, "নেবুবাগানে কী থাকবে?"

দিপু বলল, "বৃষ্টি কমে গেছে। আমি একবার গিয়ে দেখতে চাই।"

সবাই মিলে চলে এল লেবুবাগানে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সেই বাগান। প্রায় দেড়শো-দুশো গাছ নিয়ে জঙ্গলের মতন। জায়গাটায় খুব সুন্দর গন্ধ।

গাছগুলো সব লাইন করে সাজানো। তার মধ্যে এক লাইনের ঠিক ছ'টা গাছ কেউ তুলে ফেলে দিয়েছে। গাছগুলো সব প্রায় একমানুষ সমান উঁচু। এত বড় গাছ টেনে উপড়ে ফেলা সহজ নয়। শাবল বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে গোড়াগুলি আগে খুঁড়ে নেওয়া হয়েছে মনে হয়। কয়েকটা বেশ বড় বড় গর্ত দেখা যাচ্ছে।

গাছগুলোর এই রকম অবস্থা দেখে মধু খুব দুঃখ পেয়েছে। সে কপালে হাত দিয়ে বলল, "ছি ছি ছি ছি! কত কষ্ট করে বড়বাবু আর আমি এই গাছগুলো লাগিয়েছি! কে এমন সর্বনাশ করল?"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "জ্যাঠাবাবুর লাঠিটা কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?"

কেষ্ট বলল, "এইখেনটাতেই গো দিদিমণি। ঠিক এইখেনটায়। বড়বাবুও রাত্তিরে এখেনেই এয়েছিলেন।"

ইরানি মধুর দিকে ফিরে জানতে চাইল, "জ্যাঠামশাই কি এখানে কিছু পুঁতে রেখেছিলেন বলে আপনার মনে হয়? আপনি নিশ্চয়ই তাহলে সেটা জানতেন?"

মধু বলল, "এখানে আবার কী পুঁতে রাখবেন তিনি? ঘোড়াডাঙায় ব্যাঙ্ক হয়েছে, টাকা-পয়সা তো সব সেখানেই জমা পড়ে। বড়বাবুর কাছে আর তো কোনো দামি জিনিস ছিল না।"

দিপু লেবুবাগানের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, মধু তাকে বলল, "উঁহু, ভেতরে যাবেন না। এই গাছে কাঁটা আছে, গায়ে ফুটে যাবে!"

দিপু বলল, "আমি সাবধানে যাব!"

গুঁড়ি মেরে নিচু হয়ে সে দেখল, ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। বেশি দূর দেখা যায় না। একজন মানুষ এর মধ্যে ঢুকে অনায়াসে হারিয়ে যেতে পারে।

দিপুও লেবুবাগানের মধ্যে হারিয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি: অনুপ রায়

বালি বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন

বালি বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়ে যখন পৌঁছলাম, চারদিকে তখন কেবল স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ভিড়। নানান স্কুল থেকে তাঁরা দলে-দলে আসছে! সারি বেঁধে ঢুকছে। আবার আরেক দরজা দিয়ে দেখি তেমনি সুশৃঙ্খলভাবে বেরিয়েও যাচ্ছে। জানতে পারা গেল, হাওড়া জেলা যুবকল্যাণ পর্ষদের উদ্যোগে তখন সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিজ্ঞান মেলা।

বালি বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯২৭ সালে। অবশ্য ১৯৫০ সালের পর এই বিদ্যালয় সরকারি স্বীকৃতি পায়। সেকালে এই এলাকায় শুধুই মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এই বিদ্যালয়েরই জনৈকা ছাত্রী বালিগ্রামে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করেন।

প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রতি বছর গড়ে ১০০ জন ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ জন প্রথম বিভাগে যায়। বাকিরা সবাই দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে।

"*কী করে পরীক্ষায় ভাল করা যায়,*" এই প্রশ্নের জবাবে প্রধানা শিক্ষিকা বললেন, "লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকা আর

'বাক্য সম্পূর্ণ করে উত্তর দিতে হবে। উত্তর দেবার ভঙ্গির মধ্যে একটা গোছানো, পরিপাটি ভাব থাকা দরকার।'

•

'বেশি লিখলেই বেশি নম্বর পাওয়া যায় না। লেখার মধ্যে একটা পরিমিতিবোধ থাকা দরকার।'

সুপরিকল্পিতভাবে পরিশ্রম করাই হল পরীক্ষায় সাফল্যের চাবিকাঠি। আগ্রহ অবশ্য সবসময়েই আপনা থেকে আসে না। লেখাপড়ায় আগ্রহ তৈরি করতে হয়। এ-ব্যাপারে বাড়িতে যেমন অভিভাবকের দায়িত্ব আছে, তেমনি বিদ্যালয়ের পরিবেশেরও আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।"

প্রশ্ন করেছিলাম, "*ইংরেজি ও বাংলা কীভাবে পড়া উচিত?*" উত্তরে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, "যেহেতু এই দুটো বিষয়েই আজকাল লাইন তুলে প্রশ্ন দেওয়া হয়, সেজন্যে টেক্সট বই খুব মন দিয়ে পড়া দরকার। সবসময়েই বাক্য সম্পূর্ণ করে উত্তর দিতে হবে। উত্তর দেবার ভঙ্গির মধ্যে একটা গোছানো পরিপাটি ভাব থাকা দরকার। উত্তর যেন এলোমেলো না হয়। ইংরেজির কমপোজিশন নির্ভুল হবার ব্যাপারটা অনেকাংশেই নির্ভর করে অনুশীলনের উপরে। নিয়মিত ট্রানস্লেশন করা দরকার। আর তা করার সময়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের রীতি যে ভিন্ন এটা মনে রাখা জরুরি।

"বাংলা পড়ার সময় গল্প-কবিতা অথবা প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুটি প্রথমে ভাল করে জেনে নিতে হবে। তারপর ছোট-ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে সমগ্র

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

ক্লাস টেন-এর এবারের ফার্স্ট গার্ল সোমা ভৌমিক। সোমা বরাবরই এই স্কুলে পড়ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে সোমাই ক্লাসে প্রথম হচ্ছে। এবারে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ উঠতে সোমা শতকরা ৭৫ নম্বর পেয়েছে।

সকালে ঘণ্টা দুয়েক আর সন্ধেয় ঘণ্টা চারেক সোমা পড়াশোনা করে। রোজই পড়তে বসে আগে স্কুলের পরের দিনের পড়াটা করে নেয়। সব বিষয়েই সে প্রশ্ন লিখে তৈরি করে।

পড়াশোনার ব্যাপারে প্রধানত স্কুলের দিদিরাই তাকে সাহায্য করেন। প্রশ্ন লিখে সে আগে দিদিদের দিয়ে দেখিয়ে সংশোধন করে নেয়। তারপর সেটা তৈরি করে। সে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রথমে টেক্সট বই ভালভাবে পড়ে অভিধান দেখে অজানা শব্দের অর্থ ও প্রতিশব্দ শিখে নেয়। ইতিহাস ভূগোল,

ও বিজ্ঞানে পাঠ্যবই পড়ে নিয়ে তারপর রেফারেন্স বই থেকে যতটা সম্ভব অতিরিক্ত পয়েন্ট সংগ্রহের চেষ্টা করে।

বড় হয়ে কী হওয়ার চেষ্টা করবে, এ সম্পর্কে সে এই মুহূর্তে কিছু বলতে রাজি নয়। কারণ সেটা মাধ্যমিক এবং তারপর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে।

আনন্দমেলা তার প্রিয় পত্রিকা।

পাঠ্যাংশটি বিস্তৃতভাবে তৈরি করতে হবে। ভাল করে রিডিং পড়ার অভ্যাস করা দরকার। আবৃত্তিরও চর্চা করতে হবে।

"অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে *বিজ্ঞান পড়ার সময়ে* সংজ্ঞা না-বুঝে মুখস্থ করা কখনই উচিত নয়। উত্তরদানে দক্ষতা আনার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ই একটু বিস্তৃতভাবে পড়লে ভাল, বিশেষত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। অঙ্ক তো ছেলেবেলা থেকেই সঠিক নিয়মে করার অভ্যাস করা দরকার। অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা সহজ অঙ্কও অযথা জটিল নিয়মে করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। *জীবনবিজ্ঞানে* ছবি আঁকার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি।

"*ইতিহাসে* অনেক সময় ছেলেমেয়েরা অত্যধিক বেশি লেখে। কিন্তু সবসময় বেশি লিখলেই বেশি নম্বর পাওয়া যায় না। লেখার মধ্যে একটা পরিমিতিবোধ থাকা দরকার। ঐতিহাসিক মানচিত্র ব্যবহার করলে খুবই ভাল।

"*ভূগোলে* মানচিত্র আঁকা অত্যাবশ্যক। অর্থনৈতিক ভূগোলে তথ্য যেন সবসময়ে সাম্প্রতিক হয়। ইতিহাস ও ভূগোলে সংক্ষিপ্ত এবং বড় প্রশ্ন দুটোই থাকে। তাই বই খুব খুঁটিয়ে পড়া প্রয়োজন।

"*কর্মশিক্ষা* একটি নতুন বিষয়। হাতের কাজে অনেকেরই স্বাভাবিক পারদর্শিতা থাকে। কিন্তু সকলেরই এই বিষয়টিতে যত্নশীল হওয়া উচিত। স্কুলে শেখানো বিষয়টি যথাসময়ে নিজের হাতে করতে হবে।"

আনন্দমেলা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল "এটি কিশোরবয়সীদের একটি উপকারী পত্রিকা।"

অপরাজিতা

বোঝাপড়া

মৃণালকান্তি দাশ

"ড্রয়ারে দশটা টাকা
রাখলাম আজই—
এক্ষুনি উবে গেল
এ কী ভোজবাজি !
এ ঘরে কে-ই বা থাকে
তুমি আমি ছাড়া
চুপ করে আছ কেন
দিচ্ছ না সাড়া ?"

"আমি কি এতই বোকা
তোর কথা শুনে,
তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব
দশ টাকা গুনে ?
ঝগড়া করা কি ভাল
পাশাপাশি থাকি—
আমি দেব পাঁচ টাকা
তুই দিস বাকি !"

ছবি : দেবাশিস দেব

বৈদ্যনাথ

আয়ুর্বেদিক টুথপাউডার (লাল)

দাঁতের পরিচর্যায়
বেছে নিন প্রকৃতির উপহার
ব্যবহার করুন

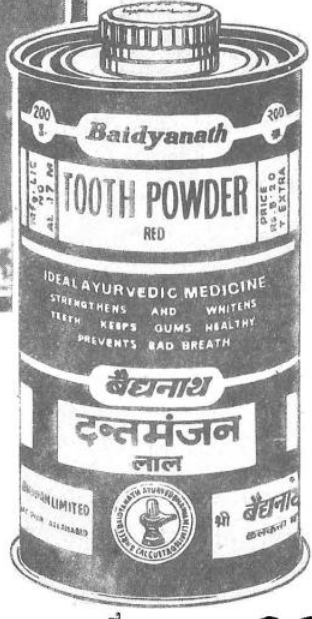

আয়ুর্বেদিক টুথপাউডার (লাল) মাড়ির রক্তক্ষরণ ও দন্তক্ষয় রোধ করে।

শ্রী বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড

কলকাতা ● পাটনা ● ঝাঁসি ● নাগপুর ● এলাহাবাদ

AVID/BAB/1-84/BEN

টোপিওয়ালা ও একটি খুনের গল্প

পুনা শহরে খুব শীত পড়ে না। কিন্তু যে কয়েক মাস শীত থাকে, সে-সময় খুব আরামের। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও কাঁধের উপর একটা শাল রেখে রোদ্দুর পোহাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন ভাল ছিল না। পানের বাটা থেকে একটা আস্ত পান ও কয়েক টুকরো সুপুরি তুলে নিলেন। অপ্রসন্ন মুখে মন্ত্রী সদাশিব মানকেশ্বরকে বললেন, "টোপিওয়ালাদের কাণ্ড দেখলে ? আবার গায়কোয়াড়ের হিসেব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে !"

সদাশিব মানকেশ্বর বললেন, "হুজুর, আংরেজদের কথা আর বলবেন না। এই হিসেবপত্তরের কাজ দশ বছর ধরে বেশ ঢিমেতালে চলছিল। তাতে কি কারুর কোনো ক্ষতি হয়েছে ? আজ তড়িঘড়ি হিসেব মেলাতে হবে, এ কি সহজ !"

বাজীরাও একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। গলা দিয়ে একটা শব্দ বার করলেন ; মনে হল তাঁর মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে। তিনি বললেন, "একটা জিনিস দেখেছ সদাশিব ? সেই নচ্ছার গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে নাকি আবার গায়কোয়াড় এখানে পাঠাচ্ছে !"

সদাশিব হয়তো ভাবছিলেন, সে-সব দিন আর নেই। এখন আংরেজরা যা বলে তাই হয়। কিন্তু প্রভুর মেজাজ বুঝে কথাটা আর তুললেন না। বাজীরাও পানের বাটা আবার কাছে টেনে নিলেন।

নামে দ্বিতীয় বাজীরাও বটে, কিন্তু প্রথম বাজীরাওয়ের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের বিন্দুমাত্র মিল নেই। প্রথম বাজীরাও যেমন সাহসী ছিলেন, তেমনি ভবিষ্যৎ-দর্শী। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের তুলনা হয় না। ১৮০২ সালে ইংরেজের সঙ্গে এক সন্ধির ফলে, পেশোয়া আর ইচ্ছেমতো সৈন্যসামন্ত রাখতে পারেন না। অন্য মারাঠা রাজ্যের উপরেও প্রতিপত্তি কমে গিয়েছে। বাজীরাও বললেন বটে যে, তিনি গঙ্গাধর শাস্ত্রীর মুখদর্শন করবেন না, কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলেন, রাগ দেখিয়ে লাভ নেই, পুরনো দিন আর ফিরে আসবে না। ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে আবার হিসেবপত্তরের আলোচনা চলতে লাগল। বাজীরাওয়ের মেজাজ খারাপ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। গঙ্গাধর শাস্ত্রী অন্য মহারাষ্ট্রীয়দের মতো ছিলেন না। ধীরস্থির ভাবে কথা বলা বা চলাফেরা করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তড়বড় করে কথা বলতেন, তাড়াতাড়ি হাঁটতেন, দু'একটি ইংরেজি গালিগালাজও জানতেন। পেশোয়ার নাম উঠলেই বলতেন 'সেই ড্যাম্ রাস্কেল' ! এ অবস্থায় কাজ

বেশিদূর এগোবার কথা নয়।

হিসেবও অনেক টাকার। ১৮০৬ সালে পেশোয়া বলেছিলেন, তিনি গায়কোয়াড়ের কাছ থেকে পাবেন দু'কোটি আটাত্তর লাখ ষাট হাজার টাকার বেশি। এ ছাড়াও অন্যান্য নানা খাতে আরও পঞ্চাশ লাখ টাকা। পুরনো ধারের নিয়মই হচ্ছে, যত দিন যায়, টাকার অঙ্কও ততই বেড়ে চলে। পাঁচ বছর বাদ ১৮১১ সালে পেশোয়া বললেন এই দাবির প্রথম কিস্তি বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ছিয়াশি লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকার বেশি। তা ছাড়া অন্যান্য খাতের দাবিও সেইরকম বেড়েছে। গায়কোয়াড়ও কম যান না। বললেন, পেশোয়ার কাছে তাঁরও অনেক টাকা পাওনা। কয়েক মাস এইভাবে গেল। ভবিষ্যতে যে মিটমাট হবে সে আশা কম। ইংরেজরা বলে পাঠালেন, আর আলোচনা চালিয়ে দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, চাকা যেন অন্যদিকে ঘুরছে। পেশোয়া যেন অনেকটা নরম হয়েছেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে তো তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। গুজব উঠল, তিনি নাকি তাঁর শালীর সঙ্গে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করছেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যাই হোক, বাজীরাও গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে সঙ্গে করে নাসিকে তীর্থ করতে গেলেন। সেখান থেকে আবার পণ্ঢারপুরে। পণ্ঢারপুর তখনকার দিনের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান।

পণ্ঢারপুরে যে-কয়দিন ছিলেন, গঙ্গাধর শাস্ত্রী প্রতি সন্ধ্যায় বিঠোবার মন্দিরে আরতি দেখতে যেতেন। বিঠোবাকে আমরা বলি বিষ্ণু। একদিন, ২০শে জুলাই, সন্ধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী বললেন যে, তাঁর মন্দিরে যাবার ইচ্ছে নেই। শরীর ভাল নেই। পীড়াপীড়িতে অবশ্য শেষপর্যন্ত তিনি যেতে রাজি হলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর একজন অনুচর শুনতে পেল কে একজন বলছে, "গঙ্গাধর শাস্ত্রী কোন্ লোকটি?" তার সঙ্গী উত্তর দিল, "ঐ যে, দেখছ না, গলায় সোনার হার রয়েছে।" নামকরা বিদেশী অন্য শহরে এলে এরকম জিজ্ঞাসাবাদ হয়েই থাকে। মন্দিরে আরতি শেষ হয়ে গেল। পেশোয়ার সহচর ত্র্যম্বকজি ডাংলে তখন মন্দিরে ছিলেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দু' একটি কথা হল। শাস্ত্রী তার পর বাড়ির দিকে ফিরলেন।

পথে কী হল বলছি। মন্দির থেকে তাঁরা কয়েক পা এগিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনজন লোক গঙ্গাধর শাস্ত্রীর পিছন থেকে তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে দৌড়ে চলে গেল। প্রথমে মনে হল, তাদের ডান হাতে একটি করে চাদর ঝুলছে। মিনিটখানেক পরে বোঝা গেল যে শুধু কাপড় নয়, কাপড়ের তলায় ঢাকা তলোয়ার। প্রথমে যে লোকটি ছিল, সে তলোয়ার দিয়ে গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে আঘাত করল। গঙ্গাধর শাস্ত্রী তখনও দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করছিলেন। দ্বিতীয় লোকটি তাঁর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তৃতীয় লোকটি তলোয়ার দিয়ে মাথায় কোপ মারল। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে কয়েকজন সৈন্যসামন্ত বরকন্দাজ ছিল। তাদের চোখের সামনে খুন হয়ে গেল।

হত্যা করা পাপ। সেই যুগে ব্রহ্মহত্যার মতো পাপ আর কিছু ছিল না। তা ছাড়া, যাঁকে খুন করা হল, তিনি তো

সাধারণ লোক ছিলেন না। গায়কোয়াড়ের দূত। তাঁর মৃত্যুতে যে শোরগোল উঠবে, সে তো জানা কথা। তখন প্রতি মারাঠা রাজ্যে একজন করে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী থাকবার নিয়ম ছিল। পুনায় যিনি ছিলেন, তাঁর নাম মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিন্‌স্টোন। তিনি কাজকর্মে সুদক্ষ বলে নাম ছিল। তা ছাড়া তিনি পণ্ডিত লোকও ছিলেন। এলফিন্‌স্টোনের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ত্র্যম্বকজি ডাংলেই প্রধানত হত্যার জন্য দায়ী। পেশোয়াকে বলে পাঠালেন, ত্র্যম্বকজিকে এখনই বন্দী করা হোক। পেশোয়া অনেক ওজর-আপত্তি করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের ভাবগতিক দেখে বেশিদূর যেতে সাহস করলেন না। বড়োদা রাজ্যে গোবিন্দরাও বন্ধুজি ও ভগবন্ত রাওকে গ্রেপ্তার করা হল। সেই সঙ্গে ত্র্যম্বকজিকেও বন্দী করে বোম্বাইয়ের কাছে থানা কেল্লায় রাখা হল। সেখানে তাঁকে অবশ্য বেশিদিন আটকে রাখা যায়নি। ইংরেজরা ভেবেছিলেন, থানা কেল্লায় সৈন্যদের মধ্যে একজনও মহারাষ্ট্রীয় প্রহরী থাকবে না, তাহলে ষড়যন্ত্র হতে পারে। কিন্তু সৈন্যরা সবাই ইংরেজ। তারা মারাঠি ভাষা একেবারে বুঝত্ না। বিপদ সেই দিক থেকেই এল। প্রতিদিন দুপুরে শোনা যেত দুর্গের বাইরে একজন ঘেসেড়া মারাঠি গান গাইছে। সেটি আসলে পালাবার সঙ্কেত। কিন্তু একমাত্র ত্র্যম্বকজি তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। কয়েক বছর পরে ১৮১৯ সালে যখন পেশোয়া-রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন একজন পাদরি, বিশপ হিবার, দাক্ষিণাত্যে ঘুরতে ঘুরতে এই গানটির হদিস পেয়েছিলেন। গানটি তিনি

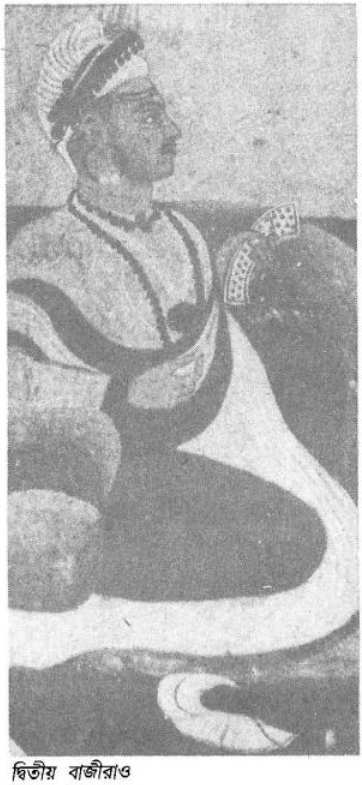

দ্বিতীয় বাজীরাও

ইংরেজিতে অনুবাদ করে গিয়েছেন। আসল মারাঠি গানটি এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হিবারের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন 'পাক্ষিক আনন্দমেলা'র সম্পাদক-মশাই। সেটি এইরকম :

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে
তীরন্দাজ,
ঘোড়াগুলি আছে বৃক্ষতলে।
কোথা পাব আমি সেই বীর, বিনা
বাক্যে আজ

সঙ্গী হবে যে এ-জঙ্গলে ?
যুদ্ধের ঘোড়া পঞ্চান্নটি
তৈরি এই,
যোদ্ধা কিন্তু চুয়ান্নের
বেশি নেই, বাদবাকিটি এখানে
এসে গেলেই
দাক্ষিণাত্য জাগবে ফের।

ত্র্যম্বকজি সেই পঞ্চান্নতম যোদ্ধা। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সমুদ্রের খাঁড়ি পার হলেই তো পেশোয়া রাজ্য। ত্র্যম্বকজি কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিহারের চুনার দুর্গে নিয়ে যাওয়া হল। ভগবন্ত রাও, গোবিন্দরাও বন্ধুজি ও বড়োদার দেওয়ান সীতারামকেও অন্যত্র বন্দী করে রাখা হয়েছিল। চুনারে ত্র্যম্বকজি আরও পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। হিবার সাহেবও চুনারে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। গারদের ওদিকে ত্র্যম্বকজি ; সপ্রতিভ চেহারা, ভেঙে পড়েননি, গায়ে ময়লা পোশাক। এই কি গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যাকারী ? না হত্যার সূত্র খুঁজতে অন্যত্র, গায়কোয়াড়ের রাজ্যে, যেতে হবে ? ভগবন্ত রাও, গোবিন্দরাও বন্ধুজি, না দেওয়ান সীতারাম ? কে হত্যাকারী ?

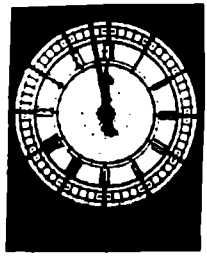

নিম-বেগুন

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

অলাবুটা রেখে
নিমপাতা আনো যদু।
অলাবু জানো না ?
ছোটকাকা জানে,—কদু

ঘটে ঢুকল না ?
মানে অশ্বের ডিম্ব।
যাও, তাড়াতাড়ি
নিয়ে এসো কিছু নিম্ব।
আমাদের খেতে,
বাহবা কী মজা, ধিন্‌তাক ;
ভোরে উঠে দেখি
ফলে আছে এক বৃন্তাক।
তুমিও দেখছি
বোঝো নাকো ছার কাকু ;
বৃন্তাক মানে
সাদামাটা বার্তাকু।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

হেকলাভিক বনাম রোভার্স। উয়েফা কাপের খেলার দ্বিতীয়ার্ধে জিমি স্রেডকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফল এখন ১—১। রোভার্স পেনাল্টি পেয়েছে।
চমৎকার শট!
কিন্তু...
গোলকি ঠেকিয়ে দিয়েছে!
আঃ!
ক্রস-বারে ধাক্কা খেয়ে বল ফিরছে!
রোভার্সের খেলোয়াড়রা হতভম্ব...
যাঃ!
বল বাইরে পাঠিয়ে দিল!
খেলা শেষের হুইসল। হেকলাভিক অসাধ্যসাধন করেছে।
আনন্দে ওরা আত্মহারা!
হেকলাভিকের গোলরক্ষককে তারিফ করছে সবাই...
চমৎকার খেলেছ!
তবে ফিরতি-খেলায় রোভার্স জিতবেই!
রয় কিন্তু চিন্তিত...
ব্যাপারটা সহজ হবে না।
বিদেশে জিতলে এক-গোল তো দুই গোলের সমান।
বড়দিনের উৎসবে সমর্থক-সম্মাবেশ...
Christmas
জিমি এখনও আসেনি
জাতীয় দল থেকে টেনে আনায় ছেলেটা কি এখনও রাগে ফুঁসছে?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

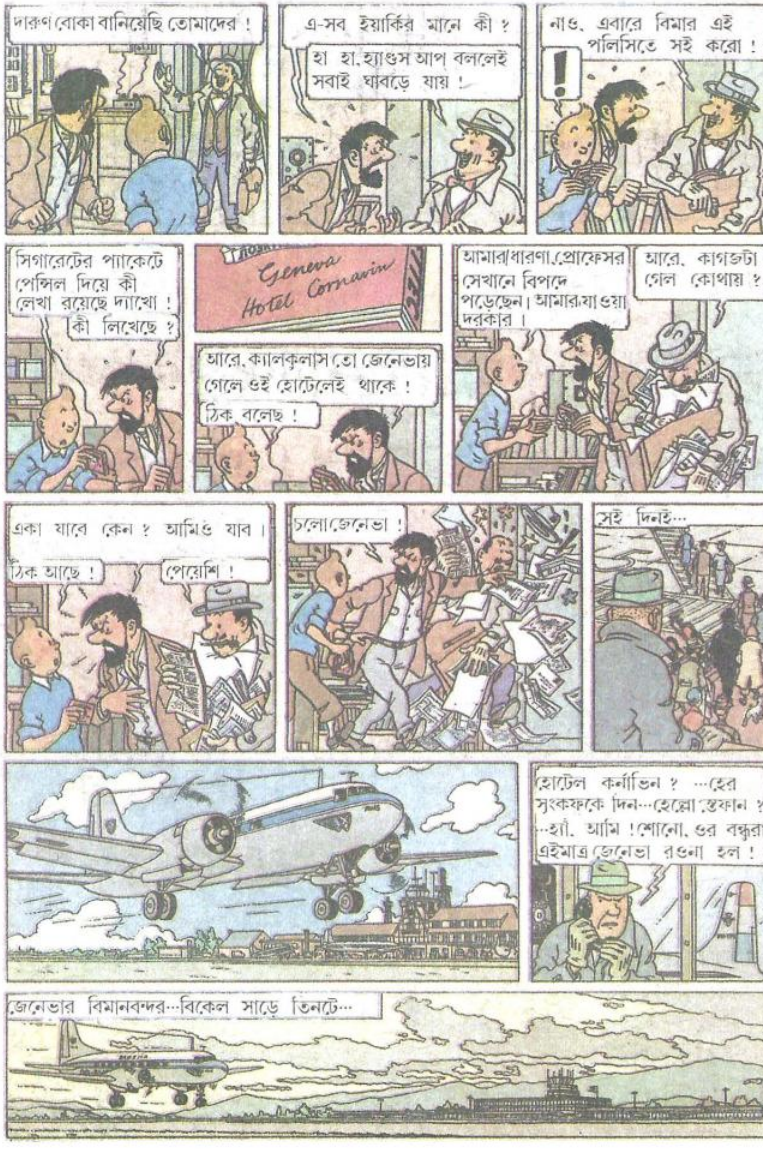

দারুণ বোকা বানিয়েছি তোমাদের !
এ-সব ইয়ার্কির মানে কী ?
হা হা, হ্যাণ্ডস আপ বললেই সবাই ঘাবড়ে যায় !
নাও, এবারে বিমার এই পলিসিতে সই করো !
সিগারেটের প্যাকেটে পেন্সিল দিয়ে কী লেখা রয়েছে দ্যাখো !
কী লিখেছে ?
Geneva Hotel Cornavin
আরে, ক্যালকুলাস তো জেনেভায় গেলে ওই হোটেলেই থাকে !
ঠিক বলেছ !
আমার ধারণা, প্রোফেসর সেখানে বিপদে পড়েছেন। আমার যাওয়া দরকার।
আরে, কাগজটা গেল কোথায় ?
একা যাবে কেন ? আমিও যাব।
ঠিক আছে !
পেয়েছি !
চলো জেনেভা !
সেই দিনই...
হোটেল কর্নাভিন ? ...হের সংকফকে দিন...হেল্লো স্তেফান ? ...হ্যাঁ, আমি ! শোনো, ওর বন্ধুরা এইমাত্র জেনেভা রওনা হল !
জেনেভার বিমানবন্দর...বিকেল সাড়ে তিনটে...

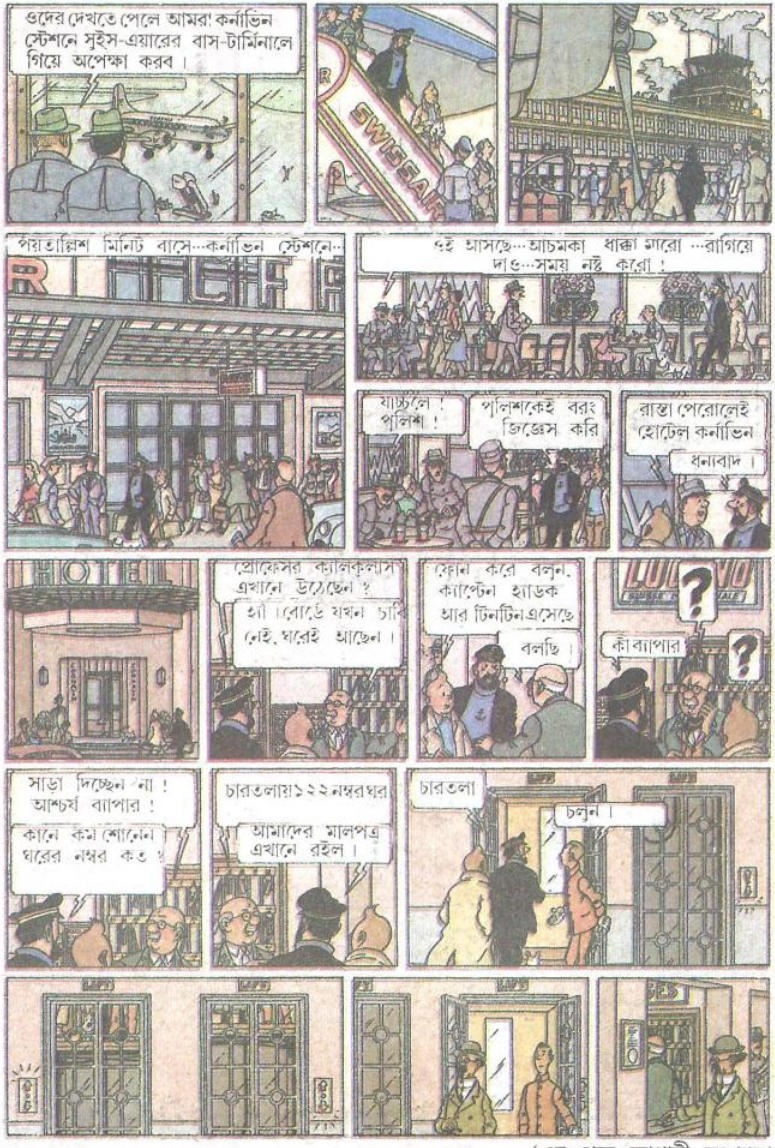

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

॥ ১৮ ॥

কানপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম অনেক চিন্তা নিয়ে। সামনেই বাংলা-হায়দরাবাদের খেলা। হায়দরাবাদের হয়ে গিলক্রিস্ট নিশ্চয়ই খেলবে। বাংলা দলের আধখানাকে হাসপাতালে পাঠাবার ইচ্ছের কথা সে আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

তখন আমি বাংলার ক্যাপ্টেন। সি এ বি-র নতু কোলে আমাকে একদিন ডাকলেন। "পঙ্কজ, সামনেই তো ভাইটাল ম্যাচ। হায়দরাবাদ টিম যথেষ্ট স্ট্রং। বাঘা-বাঘা সব ব্যাটসম্যান। তার ওপর গিলক্রিস্টের মতো দুরন্ত বোলার রয়েছে। তোমাদের সামনে একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ এসে পড়েছে।"

ঘাড় নাড়লাম। তা বটে। কানপুরে ডাইনিং টেবিলে গিলক্রিস্টের চেঁচামেচির কথা নতুদা জানেন কিনা জানি না, তবে ওই বোলারটা কথায় ও কাজে তফাত রাখে না। আসলে নতুদা অন্য কিছু বলতে চাইছিলেন। এবং একটু পরে বলেই ফেললেন। "মূল ভয় গিলক্রিস্টকে নিয়ে। তুমি ওকে খেলেছ, ওকে জানো। কিন্তু বাকিরা তো জানে না। ওই ভীষণ বোলিংয়ের সামনে তারা দাঁড়াতে পারবে কি ?"

কথাটা সত্য। কিন্তু সেজন্য ভেঙে পড়লে তো চলবে না। "তাতে কী হয়েছে, অজানা বোলারকেই তো বড় আসরে খেলতে হয়। আর আমাদের খেলোয়াড়রা খুব খারাপ খেলবে বলে মনে হয় না। একটু বেশি সতর্ক হয়ে খেলতে হবে এই যা।"

নতুদার মুখ থেকে তবু চিন্তার মেঘ গেল না। তখন নতুদাকে একটা টোপ ফেলার প্রস্তাব করলাম। "এক কাজ করুন, ঘোষণা করে করে দিন—যে ভাল খেলবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। সেঞ্চুরি করলে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে। তেমনিভাবে অর্ধশতরানের জন্য, পাঁচ উইকেট পাওয়ার জন্য, বেশি ক্যাচ ধরার জন্যও পুরস্কার ঘোষণা করুন।"

কথাটা বোধহয় নতুদার মনে ধরল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ব্যাপারটা মন্দ নয়। বেশ তাই হবে। এখুনি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে দিচ্ছি।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তাহলে সেঞ্চুরির পুরস্কারটা আমার নামে লিখে রাখুন। ও টাকাটা আমিই নেব।"

খেলার আগে যারা ফিল্ডিং করবে তাদের কতগুলো বল দেওয়া হয়। তার মধ্য থেকে দল বেছে নেয় দু-তিনটে বল। কোন্ বলটা দিয়ে তারা প্রথমে শুরু করবে

বা কোন্‌টা হবে তাদের দ্বিতীয় নতুন বল, এটা তাদের পছন্দের ওপর নির্ভর করে। হায়দরাবাদ দলের যে লোকাল ম্যানেজার ছিল সে ছোকরা হঠাৎ খেলা শুরু হওয়ার আগে হাঁপাতে-হাঁপাতে আমাদের ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়ল। "পঙ্কজদা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"কী কথা ?"

"শোনো, তুমি খুব সাবধানে খেলবে।"

আমি তো অবাক। এ হঠাৎ এমন কথা বলছে কেন ? ছেলেটার চোখে-মুখে কেমন যেন ভয়ের ছাপ। প্যাড বাঁধতে বাঁধতে বললাম, "কেন, কী হয়েছে ? খুলে বলো সব কিছু।" এবার সে ভয়ত্রস্ত গলায় জানাল, হায়দরাবাদকে যখন বল বাছতে দেওয়া হয়, তখন গিলক্রিস্ট দুটো বল তুলে নেয়। মাটিতে ধাপিয়ে বল দুটো নানাভাবে পরীক্ষা করতে করতে সে বলেছে, পঙ্কজের মাথা ফাটাবার পক্ষে বলদুটো যথেষ্ট শক্ত। অতএব আমাকে সে সতর্ক করে দিতে এসেছে। মুখে বললাম, "বেশ তো, গিলি যদি মাথা ফাটাতে পারে ফাটাবে।" মনে মনে ভাবলাম, এ আর নতুন কী কথা। কানপুর থেকেই তো রয় গিলক্রিস্ট পঙ্কজ রায়ের মাথা-ফাটানো প্রকল্প কার্যকর করতে চাইছে।

টসে জিতেও জয়সীমা ফিল্ডিং নিলেন। তখন ইডেনের পিচ সকালের শিশিরে ভেজা। সুতরাং নিঃসন্দেহে গিলক্রিস্ট এবং জয়সীমার খুশি হওয়ার কথা। সি এ বি-র কর্তারা আমাকে ওপেন করতে বারণ করেছিলেন। তবু জেদ করে ইনিংসে সূচনা করতে গেলাম। আমাকে দেখে গিলক্রিস্ট বোধহয় উল্লাস অনুভব করেছিল। আনন্দে সে একটা মারাত্মক বাউন্সার দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। এবং তারপর প্রায় সারাক্ষণই (যতক্ষণ উইকেটে ছিলাম) নানাভাবে আমাকে আঘাত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এমনকী গোড়ার দিকে একবার ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে সরাসরি বল ছুঁড়ে আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমি সেঞ্চুরি করলাম। আর আমার সঙ্গে দারুণভাবে লড়াই করল প্রকাশ পোদ্দার, শ্যামসুন্দর মিত্র। বাংলা প্রথম ইনিংস শেষ করল ৩৮৬ রানে। গিলির বিরুদ্ধে, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে এটাকে ভাল রানই বলতে হবে। নতুদা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "শাবাশ।"

হায়দরাবাদ ব্যাট করতে নামার আগে কিং আমাকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। গিলক্রিস্টের বাউন্সারের প্রত্যুত্তর হিসেবে তিনিও কিছু বাউন্সার ছাড়তে চান। গিলির কীর্তিতে মনটা এত বিষিয়ে ছিল যে লেস্টার কিংকে অনুমতি দিয়ে ফেললাম। এবং তার ফলেই আব্বাস আলি বেগকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। কিংয়ের বলে আব্বাস কখনোই স্বস্তিতে খেলতে পারছিলেন না। শুধু আব্বাস কেন, সকলেই বিব্রত বোধ করছিলেন। তার মধ্যে আব্বাস আলি একটু বেশি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। একটা বল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল বেগের মুখের কাছে। আব্বাস না পারলেন বলের লাইন থেকে সরে যেতে, না পারলেন সেটাকে ব্যাট দিয়ে ঠেকাতে। বল সোজা গিয়ে আঘাত করল তাঁর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট-ফ্যাট ছেড়ে দিয়ে মুখ চেপে ধরলেন তিনি। কাছেই আমি ফিল্ডিং করছিলাম। দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে।

(ক্রমশ)

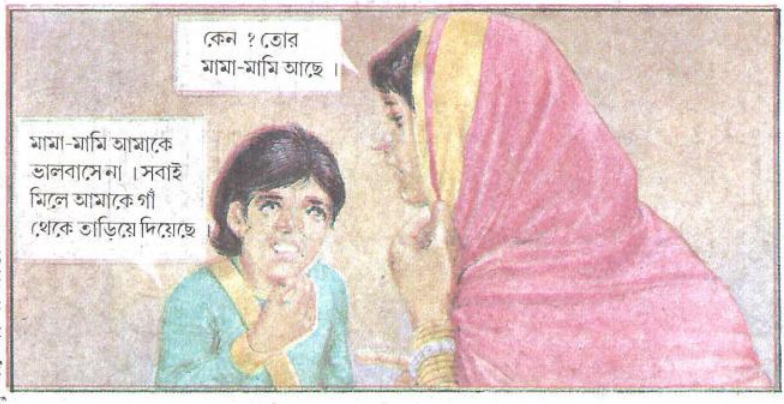
কেন ? তোর মামা-মামি আছে ।
মামা-মামি আমাকে ভালবাসে না । সবাই মিলে আমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ।

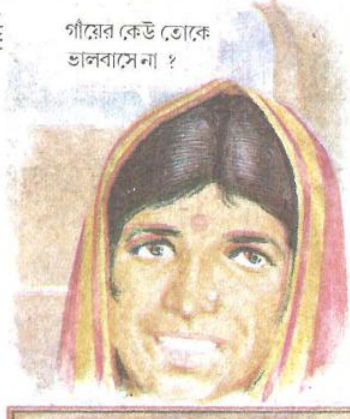
গাঁয়ের কেউ তোকে ভালবাসে না ?

কেউ না— ।

এ আংটি তবে কার জন্যে কিনেছিস ?
এই মরেছে ! মা'র কাছে এখন মিছেকথা কইব কী করে ?

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

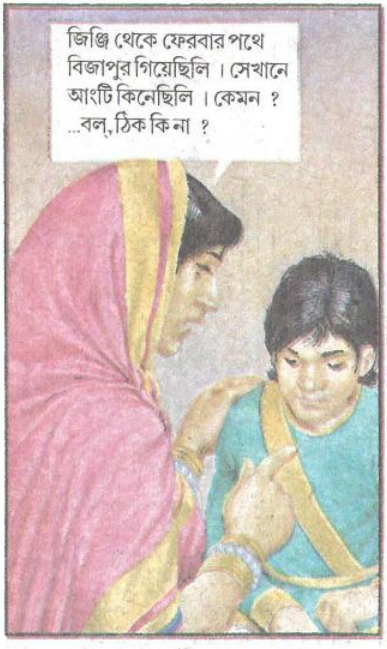

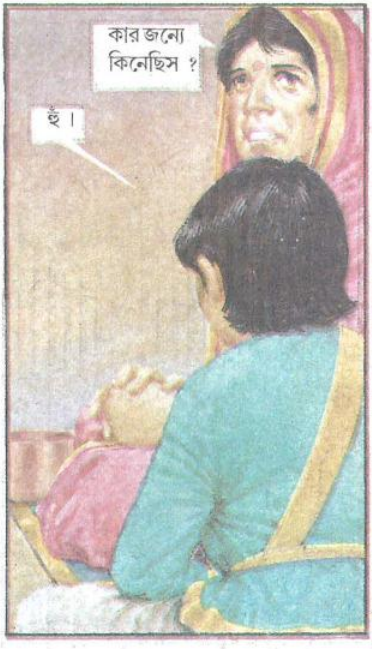

(এরপরে আগামী সংখ্যায়)

জাতিস্মর

মঞ্জিল সেন

শৈলেশবাবু তাঁর ছেলে শানুকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছেন। ইদানীং প্রায়ই সে বলে, "বাবা, দিল্লি আর ভাল লাগছে না। চলো, কলকাতায় যাই।"

শৈলেশবাবু প্রথমে ছেলের মুখে এ-কথা শুনে অবাকই হয়েছিলেন। কলকাতা কখনও দেখেনি শানু, জন্ম থেকেই দিল্লিতে। আর কতই বা বয়স ? মাত্র পাঁচ বছর, কলকাতা দিল্লি ভাল লাগা না-লাগার বোধটুকু এ বয়সে হয় কী করে ! তা ছাড়া, ছেলেবেলা থেকে যে যেখানে বড় হতে থাকে, সে-জায়গাই তার কাছে প্রিয় হবে, এটাই স্বাভাবিক।

অবাক হলেও শৈলেশবাবু প্রথম-প্রথম শানুর কথায় তেমন গুরুত্ব দেননি, ভেবেছিলেন অন্য ছেলেদের মুখে শুনে কলকাতার কথা বলছে। শানুর মা'র কথায় তিনি প্রথম চমকালেন। শানু নাকি বলেছে, ও আগের জন্মে কলকাতায় ছিল, একটা রাস্তা আর বাড়ির নম্বরও নাকি বলেছে।

যতই দিন যেতে থাকে, শানুর মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন শানুর মা-বাবা। ও যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে না, লেখাপড়ায় মন নেই, চঞ্চল চোখ দুটো কী যেন খুঁজছে সব সময়।

শৈলেশবাবু শেষ পর্যন্ত একজন সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হলেন। ভদ্রলোক বেশ আগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা করলেন ওকে, অনেক প্রশ্ন করলেন। খুব চটপট জবাব দিল শানু। কথার মধ্যে কোনো অসংলগ্নতা নেই, শুধু আগের জন্মের কথা ছাড়া। ডাক্তারবাবুর কাছে আরও একটা কথা ও বলছে, গত জন্মে ও একজন লেখক ছিল। ডাক্তারবাবু ভেবেচিন্তে শৈলেশবাবুকে একটা ভাল পরামর্শ দিলেন। বললেন, "ওকে নিয়ে একবার কলকাতায় ঘুরে আসুন না ! যে বাড়িটার কথা বলছে, সেটাও দেখে আসবেন, আর ওর কথা সত্যি কিনা সেটাও যাচাই হয়ে যাবে। হয়তো ওর মন তাতে ঠাণ্ডা হবে।"

শৈলেশবাবুর শ্বশুরবাড়ি বর্ধমান। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে তিনি বর্ধমান এলেন। প্রায় চার বছর পরে আসা। দু' তিন দিন শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে শানুকে নিয়ে আবার ট্রেনে চেপে বসলেন তিনি।

হাওড়া স্টেশনে নেমেই শানুর মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ করলেন শৈলেশবাবু। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলে যেমন খুশি হয় তেমন খুশি-খুশি ভাব, দু' চোখে উজ্জ্বলতা।

ট্যাক্সি চেপে হাওড়ার ব্রিজ পেরোতে পেরোতে পাশ দিয়ে ট্রাম যেতে দেখে শানু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "ট্রামগাড়ি।" আগে কিন্তু কখনও ট্রাম দেখেনি ও। আরও একটা কথা বলল, "গঙ্গা।" অথচ ওকে কিন্তু সে-কথা কেউ বলে দেয়নি।

স্ট্রিট ডাইরেক্টরি দেখে রাস্তাটা কোথায় হবে তার একটা ধারণা করে নিয়েছিলেন শৈলেশবাবু। রাসবিহারীর মোড়ে নেমে বাঁ দিকে একটু গিয়েই বাঁ-হাতি রাস্তা। মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাড়িটা খুঁজে বার করতে অবশ্য তেমন বেগ পেতে হল না। লাল রঙের দোতলা বাড়ি।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই শানু যেন খুব পরিচিত জায়গায় এসেছে এমন ভাবে

এগিয়ে লোহার গেটটা খুলে বলল, "এই আমার বাড়ি।" তারপর বেশ সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে চলল। শৈলেশবাবু তাড়াতাড়ি ওর একটা হাত ধরলেন।

দিনটা ছিল রবিবার। খুব সকাল-সকাল শৈলেশবাবু শানুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, দুপুরে কোথাও খেয়ে শানুকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে ফিরবেন। তাছাড়া রবিবার, বাড়ির পুরুষমানুষরা বাড়ি থাকবেন, সেটাও একটা কথা।

শানু দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে না গিয়ে একতলার একটা দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটা বন্ধ ছিল, ও খটাখট কড়া নাড়ল। শৈলেশবাবু ওকে বাধা দেবার সময় পেলেন না।

দরজা খুলে সামনে যে দাঁড়াল, তার বয়স তিরিশের বেশি হবে না। সুদর্শন চেহারা। ওদের দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

শৈলেশবাবু একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, "দেখুন, আমি দিল্লিতে থাকি, একটা বিশেষ কারণে আজ এখানে ছুটে এসেছি।"

"আপনারা ভেতরে এসে বসুন," যুবকটি বলল।

একটা সোফায় শৈলেশবাবু বসলেন, পাশে শানু।

"আসলে আমার এই ছেলের জন্যই কলকাতায় আসা," শৈলেশবাবু সামান্য বিব্রত গলায় বললেন, "কিছুদিন ধরে ও বলছে ওর নাকি গত জন্মের কথা মনে পড়ছে, কলকাতা আর এই বাড়িটার কথা বারবার বলছে। একজন সাইকিয়াট্রিস্টই আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন ওকে যেন একবার এখানে ঘুরিয়ে নিয়ে যাই।"

যুবকটির মুখে ফুটে উঠল কৌতুকের

হাসি, যেন সমস্ত ব্যাপারটাই সে অবিশ্বাস করছে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা মজার খোরাকও যেন পেয়েছে। বলল, "কী খোকা, এই বাড়িটা চিনতে পারো?"

শানু ভুরু কুঁচকে ওকে দেখছিল, মুখে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য, হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি যে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়ছিলে, সেটা কি শেষ করেছ, না কস্টিংয়ের মতো দু'দিন পড়ে সেটাও ছেড়ে দিয়েছ?"

স্পষ্ট উচ্চারণ, কোনো জড়তা নেই।

যুবকটি যেন বজ্রাহত। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। ঠিক সেই সময় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি মেয়ে কী একটা কাজে ঘরে ঢুকেছিল। পরনের শাড়িটা আধময়লা। তাকে দেখেই শানু বলে উঠল, "কী রে আরতি, কেমন আছিস?"

মেয়েটি তো হতভম্ব!

এবার বেরিয়ে এলেন এক বিধবা মহিলা, তিনি বোধহয় পাশের ঘর থেকে সব শুনছিলেন, আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেননি। তাঁকে দেখেই যুবকটি বলে উঠল, "মা !"

ভদ্রমহিলা আরেকটা চেয়ারে বসলেন। তাঁকে দেখেই শানু কিন্তু বাবার গায়ের সঙ্গে যেন সেঁটে যেতে চাইল। ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি কে, বলো তো ?"

"তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না," শানু বলে উঠল, "তুমি মিছিমিছি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে !"

ভদ্রমহিলার ফর্সা মুখ কালো হয়ে গেল, শৈলেশবাবু অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

পর্দার ওপাশ থেকে আঁচলে মুখ ঢাকা খুক্ খুক্ মেয়েলি কণ্ঠের হাসি কানে ভেসে

আসতেই শানু বলে উঠল, "কে হাসে ? নতুন মানুষ মনে হচ্ছে ?"

"আমার বউ," যুবকটি জবাব দিল।

"ও, তোমার বউ। ডাকো, দেখব।" যেন হুকুম।

বউটি কিন্তু নিজেই বেরিয়ে এল, ডাকতে হল না। অল্পবয়সী সুন্দরী একটি বউ।

"বাঃ, বেশ বউ হয়েছে," বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাল শানু, "আমি তো বিয়েতে ছিলাম না, তাই আগে দেখিনি।"

হঠাৎ ঘরের বড় টেবিলের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, "আমার লেখাগুলো।"

"সব যত্ন করে তুলে রাখা হয়েছে," যুবকটি জবাব দিল, তার গলার স্বর একেবারে বদলে গেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে একটা শ্রদ্ধা-মেশানো বিমূঢ় ভাব।

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ভারী গলায় কে একজন বললেন, "সঞ্জয়, বাড়ি আছ ?"

যুবকটি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, "নিশিকাকু, একবারটি আসুন, একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছে।"

"কী ব্যাপার ?" বছর পঁয়ষট্টির এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পাঞ্জাবির বুকের কাছটা রিপু করা, পরনে পাজামা।

"নিশিকাকু," যুবকটি উত্তেজিতভাবে বলল,, "এই ভদ্রলোক দিল্লি থেকে এসেছেন, সঙ্গে ওঁর ছেলে। ও বলছে আগের জন্মে এখানে ছিল, আমাদের চিনতে পারছে।"

"তাই নাকি !" নিশিবাবু মজার গন্ধ পেয়ে ঘরের একমাত্র বড় কাঠের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন, তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন, "আগের জন্মের কথা

বলতে পারো তুমি ? বলো তো আমি কে ?"

"জবাব পরে দেব, তার আগে বলো, আমি ভাল লিখতাম, না তুমি ভাল লিখতে ?" মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন করল শানু, যেন সমবয়সীর সঙ্গে রসিকতা করছে। ভদ্রলোক থ।

"তুমি ...আপনি ...তুমি ...ভাল লিখতে !" নিশিবাবু যেন একটু তোতলা হয়ে গেলেন।

"তোমার 'হারান মাঝি' বইটা ভাল, না আমার 'সবুজ পাখি' বইটা ?" শানুর গলায় স্পষ্ট কৌতুকের ছোঁয়া।

"সবুজ পাখি," ভদ্রলোক এবার সহজ হবার চেষ্টা করে বললেন, আর শানুর মুখে ফুটে উঠল একটা তৃপ্তির ভাব।

"তোমাকে একটা কাজ করতে হবে নিশি," শানু এবার গম্ভীর মুখে বলল, "সেটা না হলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।"

"কী বলো, আমার সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই করব," নিশিবাবু আন্তরিকতার সুরে বললেন।

"আমার লেখাগুলোর একটা গতি করতে হবে। তুমি ওগুলো নিয়ে যাকে ভাল বোঝো ছাপতে দিয়ে দেবে, ওগুলো ছেপে বই হয়ে না-বেরুনো পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই।"

"নিশ্চয়ই করব, এ আর কী কঠিন কাজ।"

আশ্চর্য, তারপরই শানু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বাবা, চলো, আমার কাজ হয়ে গেছে।"

সকলের শত অনুরোধেও কিন্তু ও আর বসতে চাইল না, খেলও না কিছু।

যাবার আগে শৈলেশবাবু যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বাবা কতদিন হল মারা গেছেন ?"

"এই মাসেই ছ'বছর পূর্ণ হল," এবার জবাব দিলেন ভদ্রমহিলা। তাঁর দু'চোখে জল।

"তার মানে," শৈলেশবাবু হিসেব করে বললেন, "জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে এক বছরের গ্যাপ্।"

ওখান থেকে বেরিয়ে চিড়িয়াখানায় আর যাওয়া হল না, শানুই ফিরে যাবার জন্য তাড়া দিতে লাগল। সারাটা পথ ট্রেনে আর একটাও কথা বলল না ও।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শানু বলল, "বাবা, দিল্লি ফিরে চলো, এখানে আর ভাল লাগছে না।"

"সে কী !" ওর বাবা অবাক হয়ে বললেন, "তুই তো কলকাতায় আসার জন্য খেপে উঠেছিলি !"

"আমি ! তুমি যে কী বলো বাবা !" অবিশ্বাসের কণ্ঠে জবাব দিল শানু।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

আজব চিড়িয়াখানা

রতন ভট্টাচার্য

ছবি : অনুপ রায়

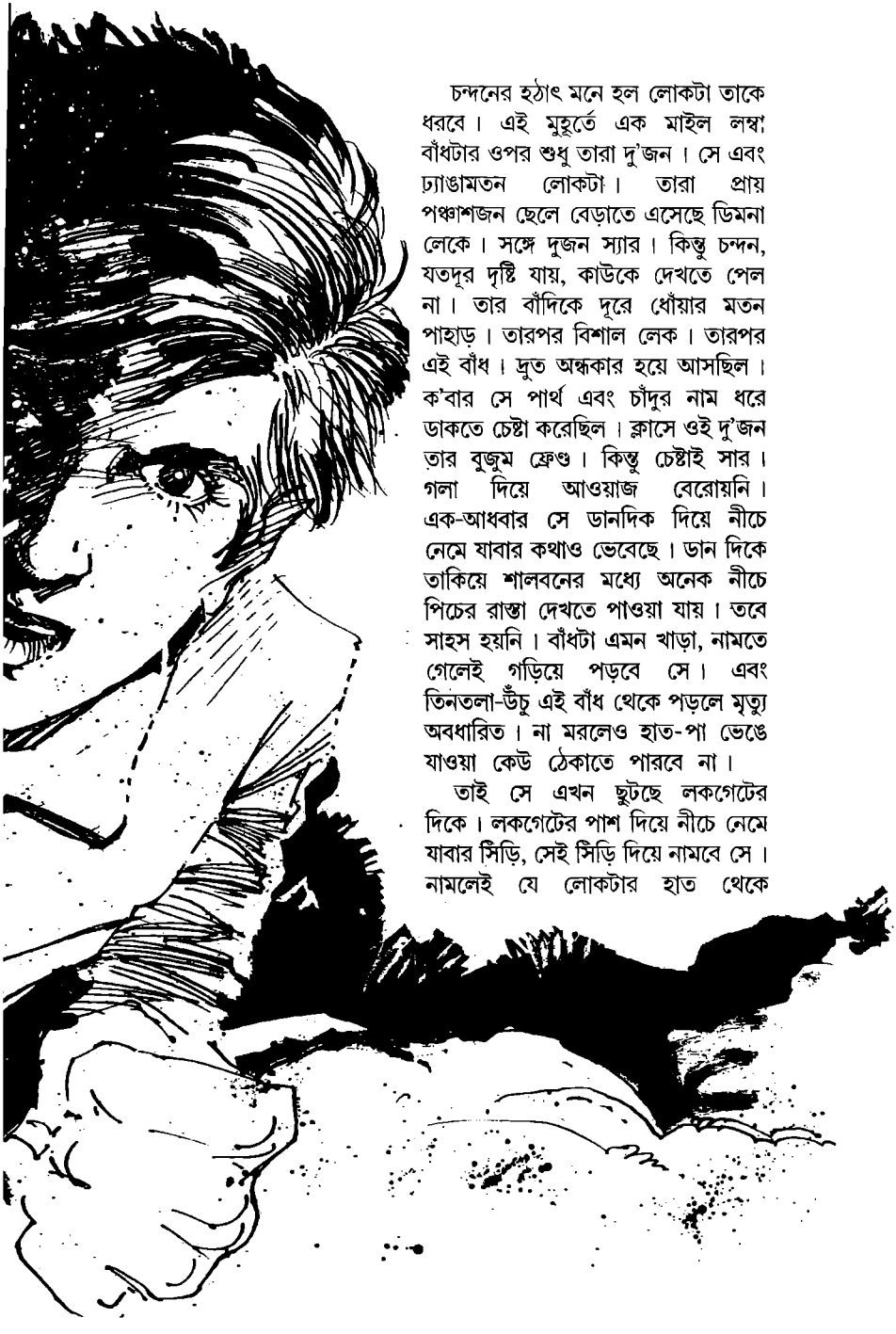

চন্দনের হঠাৎ মনে হল লোকটা তাকে ধরবে। এই মুহূর্তে এক মাইল লম্বা বাঁধটার ওপর শুধু তারা দু'জন। সে এবং ঢ্যাঙামতন লোকটা। তারা প্রায় পঞ্চাশজন ছেলে বেড়াতে এসেছে ডিমনা লেকে। সঙ্গে দুজন স্যার। কিন্তু চন্দন, যতদূর দৃষ্টি যায়, কাউকে দেখতে পেল না। তার বাঁদিকে দূরে ধোঁয়ার মতন পাহাড়। তারপর বিশাল লেক। তারপর এই বাঁধ। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছিল। ক'বার সে পার্থ এবং চাঁদুর নাম ধরে ডাকতে চেষ্টা করেছিল। ক্লাসে ওই দু'জন তার বুজুম ফ্রেণ্ড। কিন্তু চেষ্টাই সার। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি। এক-আধবার সে ডানদিক দিয়ে নীচে নেমে যাবার কথাও ভেবেছে। ডান দিকে তাকিয়ে শালবনের মধ্যে অনেক নীচে পিচের রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। তবে সাহস হয়নি। বাঁধটা এমন খাড়া, নামতে গেলেই গড়িয়ে পড়বে সে। এবং তিনতলা-উঁচু এই বাঁধ থেকে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। না মরলেও হাত-পা ভেঙে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

তাই সে এখন ছুটছে লকগেটের দিকে। লকগেটের পাশ দিয়ে নীচে নেমে যাবার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নামবে সে। নামলেই যে লোকটার হাত থেকে

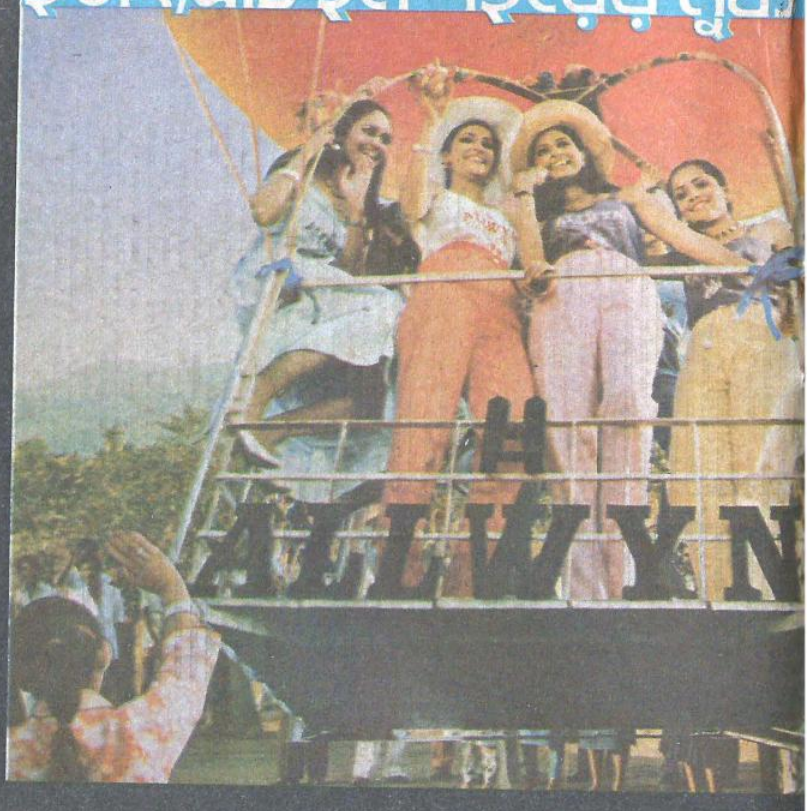

হঠাৎ, এটি হ'ল শহরের মুখ্য
অলউইন
ঘড়ি
চাবি দেওয়া • অটোমেটিক • কোয়ার্টজ
সীকো র
লাইসেন্সের অধীনে প্রস্তুত

আলোচ্য বিষয়!

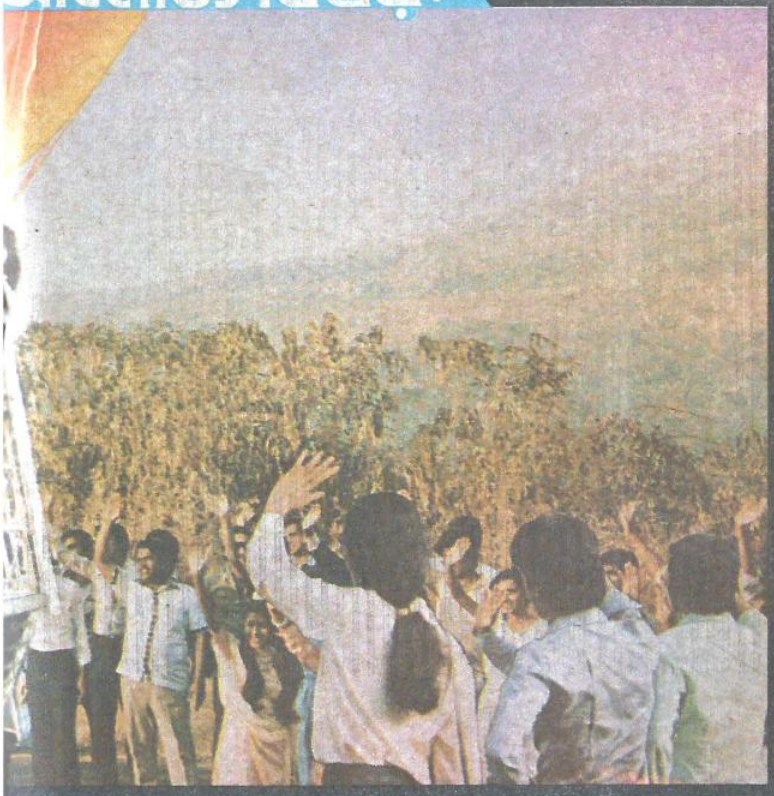

অলউইন ঘড়ি। অনিন্দ্যসুন্দর। একের পর এক শহরে এর কদর বেড়েই চলেছে। নানা প্রকারের ও আকৃষ্ট হবার মত ঘড়ি। নিখুঁত সময় দেয়। ঘড়ি নির্মাণের কারিগরী কলাকৌশল বিশ্বের সেরা সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় সযত্নে পরিপাটিভাবে নির্মিত।

অলউইনঃ শহরের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

বিজয়ী ঘড়ি ..অলউইন ঘড়ি।

Have a winning time with

ALLWYN

SAA/HAL/1401/BEN

অব্যাহতি পাওয়া যাবে, তার কোনো মানে নেই। ছুটতে ছুটতেই তার কীরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে যে, লোকটা নীচে নামবে না। যার জন্যে এত কাণ্ড সেই লোকটাকেও কিন্তু সে এখনও পর্যন্ত ভাল করে দেখেনি। সাহস করে একবার শুধু পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। সেই এক পলকের দেখায় মনে হয়েছিল লোকটা ঢ্যাঙা, চোখে মোটা কাচের চশমা আছে। আর একমাথা কাঁচাপাকা চুল। চুলগুলি এলোমেলো। উল্টোপাল্টা ঝড় উঠলে যেমন হয়, সেইরকম।

হঠাৎ চন্দনের মনে হল সে লকগেটের সামনে পৌঁছে গেছে। দেখাও গেল। অনেকটা ব্রিজের মতন। প্রায় আট-দশটা গেট। ডিমনার অতিরিক্ত জল বার করে দেবার জন্যে গেটগুলো করা হয়েছে। কংক্রিটের বিশাল ঢাল নেমে গেছে নীচে। নীচেও অনেকদূর পর্যন্ত কংক্রিটের চাতাল। হেমেনস্যার বলেছিলেন, এই লকগেট হল ডিমনার সেফটি ভাল্‌ব। আরও বলেছিলেন, ডিম্‌না লেকের তিনতলা-উঁচু মাটির বাঁধ যদি কোনোদিন ভেঙে যায়, তাহলে গোটা টাটানগর ভেসে যাবে। এতসব কথা এই ভয়ানক মুহূর্তে মনে থাকার নয়। তার মনেও নেই। শুধু পলকের জন্য, ছুটতে ছুটতে যেমন করে কোনো উগ্র গন্ধ এসে নাকে লাগে, তেমনি করে হঠাৎ কথাগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠল একবার। পরক্ষণেই হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল সে। সিঁড়ি আর শেষ হয় না। নামছে তো নামছেই। শেষকালে দু-তিনটি সিঁড়ি একসঙ্গে টপকে নীচে লাফিয়ে পড়ল সে। তারপর লোহার ঘোরানো গেট্‌টা খুলে এক ছুটে বাইরে

॥ নববর্ষের শুভেচ্ছা ॥

বৈশাখ মাস পড়ে গেছে। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাচ্ছি। নতুন বছর সকলের ভাল কাটুক এই কামনা করি।

তোমরা বোধহয় জান যে ১লা বৈশাখে তুলসী গাছ পুঁতে তাতে ভারা বেঁধে দিদিমা ঠাকুমারা এক মাস ধরে রোজ জল দিতেন। এখনও কোন কোন বাড়ীতে এসব করা হয়। তুলসী গাছকে এত যত্ন করার কারণ কি ? বাড়ীতে একটা তুলসী গাছ থাকা মানে সর্দি কাশিতে তুলসী পাতার রস আর মধু খাওয়া ওষুধ বিশেষ ছিল। তারপর তুলসী না হলে তো পুজো আচ্চাও হয় না। কিন্তু আজকের দিনে এই তুলসী গাছে জল ঢালার চেয়ে অন্য প্রয়োজনীয় কাজ আমাদের হাতে আছে। যেমন ধর জলের পরিমিত ব্যবহার। গ্রীষ্মকালে জলের কিছুটা কমতি পড়ে। তার কারণ হলো টালা পলতা থেকে যে মোটা পাইপে করে জল আসে সেগুলো পুরোনো হয়ে গেছে। ফলে বেশী চাপে জল পাঠালে সে সব পাইপ ফেটে যায়। এই পুরোনো পাইপ বদলে মোটা ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হলে আশা করা যাচ্ছে জলাভাব খানিকটা কমবে। তবে গ্রীষ্মকালে আমরা যদি বুঝেসুজে জল খরচ করি তবে সেই জলটুকু আর একজনের কাজে লাগে।

তাই কলে জল থাকলেও যেন তা বালতি ভরে পড়ে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাসি জল বদলানোর নাম করে জলের অপচয় এসব বন্ধ করতে হবে। তুলসী গাছে জল দেবার বদলে আজকের দিনের ছোটদের এটাই হবে কর্মপন্থা। যুগের সঙ্গে পা ফেলে সংস্কৃতি বা 'কালচার' পাল্টায়। তোমরাও তোমাদের নিয়ম কানুনগুলোকে সময়ের উপযোগী করে নাও।

জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩এ অকল্যাণ্ড প্রেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত

আসতেই বুকের মধ্যে দড়াম করে উঠল তার। চশমা-পরা এলোমেলো-চুল ঢ্যাঙা লোকটা তার সামনের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত শরীর অচল হয়ে গেল তার। চোখ ছানাবড়া করে সে ভাবল, কী সেই জাদুবল যাতে পেছনের লোক এমন অদ্ভুতভাবে সামনে এসে যায়। তারপর অবশ্য আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল চন্দন। চিৎকারটা আবার বুকের ভেতর যতখানি তৈরি হল, গলায় ততখানি ফুটল না। কিন্তু যেটুকু ফুটল, তারই দাপটে হঠাৎ অলৌকিকভাবে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘুম ভাঙতেই প্রথমটা একবার তড়াক করে আধশোওয়া মতন উঠে বসল সে। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল না। শুধু শুয়ে রইল। ভেতরে ভেতরে ভারী হতভম্ব হয়ে গেল। তার কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা বাস্তব, সে মেলাতে পারছিল না। চোখ মেলেও চারপাশের কিছুই চিনতে পারল না সে। চোখ থেকে ঠিক এক হাত ওপরে আলো এবং পাখা। ক্রমাগত চারদিক জুড়ে একটা শব্দ হয়ে চলেছে। শব্দটা দাঁড়িয়ে নেই। চন্দনের এই মুহূর্তের মানসিক অবস্থাটা অদ্ভুত।

স্বপ্ন এবং অচেনা বাস্তবের মাঝামাঝি এই অবস্থায় প্রায় তিন-চার মিনিট কাটল চন্দনের। তার হুঁশ ছিল না। চেতনা আড়ষ্ট এবং অসাড়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। এইভাবে দমটা যখন প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে তখন হঠাৎ ভুল করে কালো শুশুকের মতো তার স্মৃতি ভেসে উঠল। হুড়মুড় করে সব মনে পড়ে গেল তার। স্কুল থেকে ঘাটশিলায় বেড়াতে এসেছে তারা। পঞ্চাশজন ছাত্র আর দুজন স্যার। আজ সকাল আটটার ট্রেনে তারা টাটায় গিয়েছিল। নটা নাগাদ টাটায় নেমে দশখানা অটো ভাড়া করে তারা প্রথমে গিয়েছিল ডিম্না লেক। সেখান থেকে ফিরে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করে স্টেশন। স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে খাবার অর্ডার দেওয়া ছিল। খেয়ে উঠে বাসে চেপে তারা গিয়েছিল জুবিলি পার্ক। সারাদিন জুবিলি পার্কে কাটিয়ে টেলকো শহরের বাড়িঘরের সুদৃশ্য স্থাপত্য দেখে স্টেশনে এসেছিল ছটায়। সাতটায় ট্রেন ছেড়েছিল। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি সে। তার আগেই এই ফাঁকা বাঙ্কটায় উঠে শুয়ে পড়েছিল। টাটার পরের স্টেশন আসনবনি পর্যন্ত সে জেগেই ছিল। ঘুমোয়নি। তারপরে ঘুম। তারপর স্বপ্ন এবং শেষে এই জেগে ওঠা।

সব মনে পড়তে পা হাত টান করে একটা হাই তুলল চন্দন। অস্বস্তি কেটে গিয়ে এখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। পরীক্ষামূলকভাবে চোখ বুজে দেখল স্বপ্নটা আর জীবন্ত নেই। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাঁকের মুখে হারিয়ে যাওয়া রেলগাড়ির মতো স্বপ্নটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চারপাশের দৃশ্যগুলিও এখন বেশ চেনা লাগছে। তার মানে সে এখন বাঙ্কে শুয়ে আছে। গাড়িটা ছুটছে ঘাটশিলার দিকে।

মনে হয় খুব বেশি দেরি নেই ঘাটশিলার। আর একখানা হাই তুলে চন্দন ডাকল, "পার্থ! এই পা-পা-পার্থ! ঘাটশিলার আর কত বা-বা-বাকি রে?"

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু ট্রেনের ঘটাং ঘটাং শব্দটা বেড়ে গেল একটু। তার চোখ থেকে হাতখানেক দূরে গাড়ির আলো। তেমন জোর নেই আলোয়। এটা বোধহয় মার্চ মাস। মার্চের ফার্স্ট উইক। কলকাতায় দুপুরের দিকে

পাখা চললেও এখানে পাখা লাগে না এখনও। আলোর চারপাশে যে কাঁচের গোল ঢাকনাটা, তার মধ্যে একটা মরা প্রজাপতি দেখল চন্দন। প্রজাপতিটা মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল সে। কোথাও কোনো ফাঁক নেই। প্রজাপতিটা ভেতরে ঢুকল কী করে? প্রজাপতিটার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস পড়ল চন্দনের। তারপর আবার সে ডাকল, "পার্থ! এই পা-পা-পার্থ! সা-সা-সাড়া দিচ্ছিস না কেন? কত বাকি ঘা-ঘা-ঘাটশিলার?"

এবারেও সাড়া পাওয়া গেল না পার্থর। ভীষণ অবাক হয়ে মাথা তুলে নীচের দিকে তাকাল চন্দন। তাকাতেই বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল তার। কোথায় পার্থ? ভোঁ-ভোঁ। পার্থ, চাঁদু, হারু কেউ নেই। একটা ছেলেও নেই এই খোপের মধ্যে। গেল কোথায় সব? শুধু এই খোপ না। গোটা কামরাই মধ্যরাত্রির মতো কীরকম ঠাণ্ডা। নিস্তব্ধ। তার উল্টোদিকে তিনজন সাঁওতাল বসে আছে। পুরুষ। গায়ে কাপড় জড়িয়ে কেমন যেন দুঃখীর মতো বসে আছে তারা। মাথা আরও নামিয়ে তার বাঙ্কের নীচের বেঞ্চিটা দেখবার চেষ্টা করল চন্দন। কোণের দিকে বসে একজন চশমাপরা লোক একটা মোটা ইংরেজি বই পড়ছে। বেঞ্চির বাকি অংশে কাপড়মুড়ি দিয়ে কেউ ঘুমুচ্ছে। খোপের উল্টোদিকের সিঙ্গল সিট দুটো একদম ফাঁকা। ওপাশের খোপগুলো দেখতে পাচ্ছে না সে। কিন্তু কামরার ভয়ানক নিস্তব্ধতা দেখে অনুমান করতে অসুবিধে হল না যে, সেগুলোও এরকমই ফাঁকা ফাঁকা। তাহলে গেল কোথায় তাদের স্কুলের ঊনপঞ্চাশটা ছেলে আর দুজন মাস্টারমশাই? হেমেনস্যার আর কিঙ্করস্যার?

মুহূর্তে ভয়ে মুখ চোখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল চন্দনের। গলার কাছটা শক্ত কাঠ। রাত্রের ট্রেনে অজানা রাস্তায় নিজেকে হঠাৎ একা এবং পরিত্যক্ত ভাবার সঙ্গে সঙ্গে চাকার ঘটাং ঘটাং শব্দ যেন বুকের মধ্যে উঠে এল। স্তব্ধ হয়ে শুয়ে ডাকল ক'মুহূর্ত। তারপর কোনোরকমে নীচে নেমে এল সে। কামরা ঘুরে দেখবার দরকার হল না।

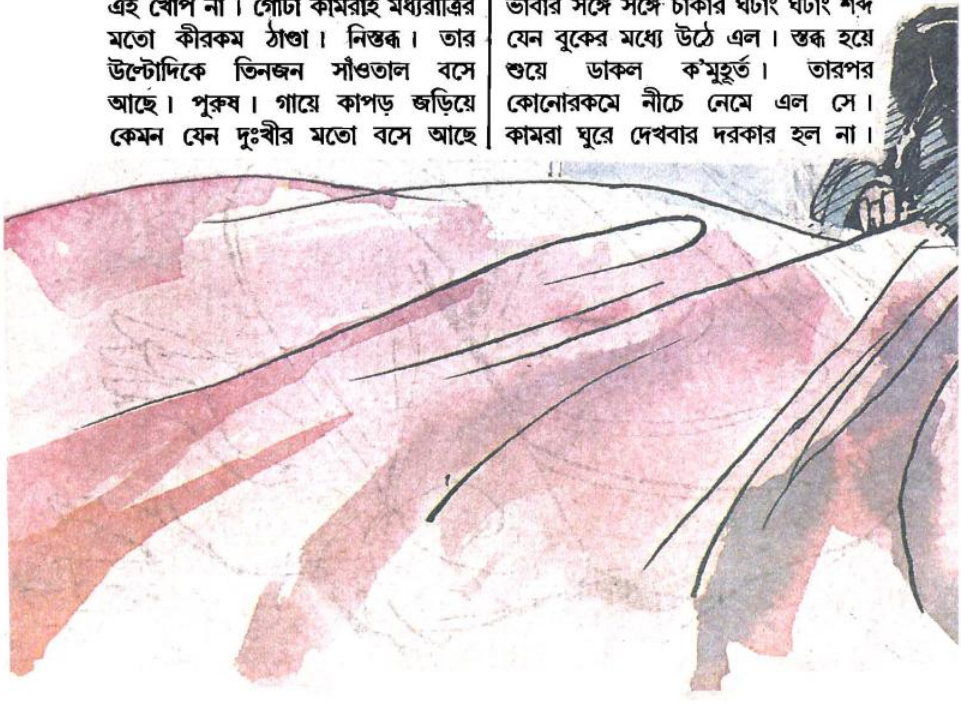

বাঙ্কে উঠে যখন শোয়, তখনকার কথা মনে পড়ল তার। অতগুলো ছেলের চিৎকার চেঁচামেচি আর গানে গোটা কামরা হাট হয়ে উঠেছিল। সে তুলনায় নীচে নামতেই কামরাটাকে তার মনে হল মধ্যরাত্রির তাকলামাকান মরুভূমি। এমনিতেই সে তোত্‌লা। ভয়ে তার তোতলামি আরও বেড়ে গেল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "মে-মে-মেলাই ছে-ছে-ছেলে ছিল গাড়িতে, কো-কো-কোথায় সব গেল বলুন তো ?"

বিশেষ কাউকে উদ্দেশ করে সে প্রশ্নটা করেনি। সকলেই প্রায় এক সঙ্গে তার দিকে ফিরল। কিন্তু কথা বলল ইংরেজি বই পড়তে থাকা সেই লোকটা। তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে তুমি খোকা ?"

"ঘা-ঘা-ঘাটশিলা।"

"ঘাটশিলা তো অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।"

"পা-পা-পার হয়ে গেছে ?" শরীরের মধ্য দিয়ে একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল চন্দনের। দাঁতে দাঁত লাগার

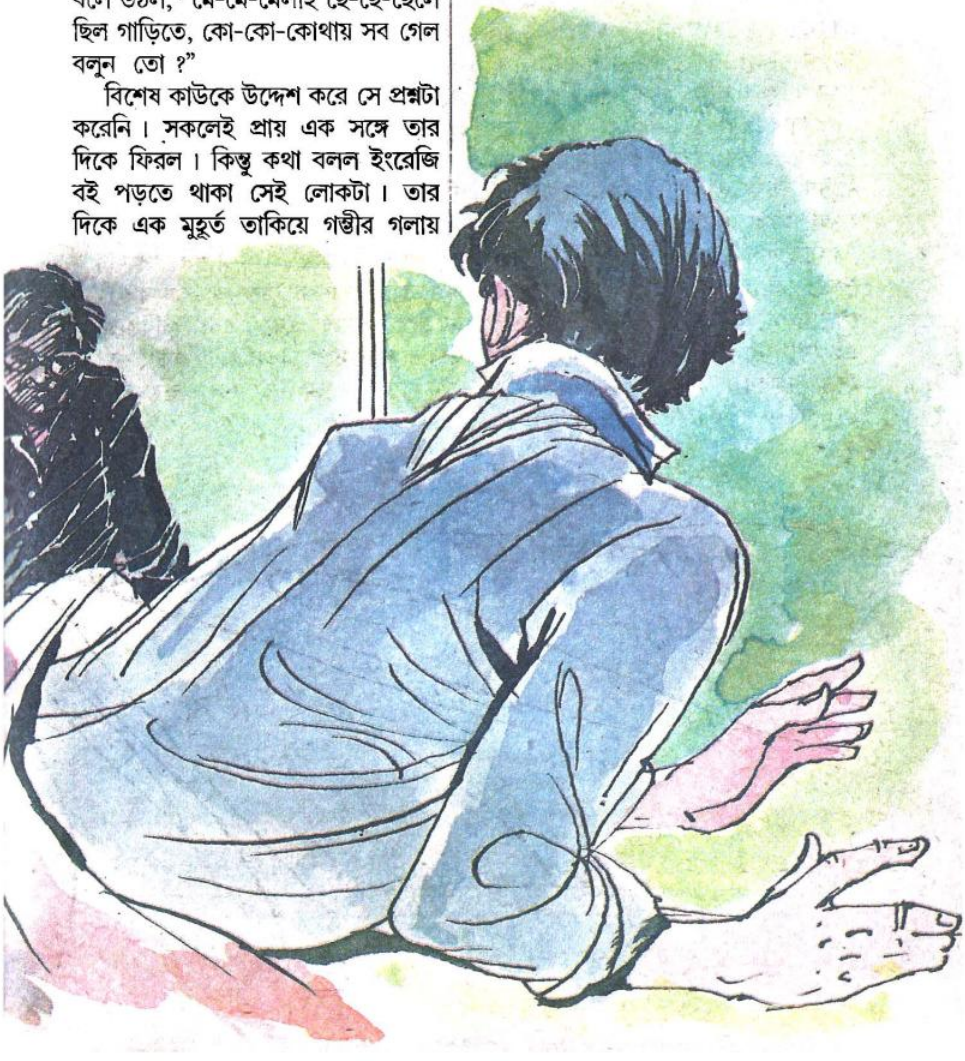

ঠকঠক আওয়াজ সে স্পষ্ট শুনতে পেল। কামরার লম্বা ফালি জনহীন রাস্তাটার দিকে একবার তাকিয়ে ধপাস করে বেঞ্চির কোনায় বসে পড়ল সে।

লোকটা আবার বলল, "অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। ঘাটশিলা, ঘাটশিলার পর ধলভূমগড়, তারপর কোক্‌পাড়া, চাকুলিয়া, গিধ্‌নি, তা ঘণ্টাখানেক তো বটেই। একটু পরে গাড়ি ঝাড়গ্রামে পৌঁছোবে। তুমি কি ওই দলে ছিলে নাকি ?"

'হ্যাঁ' করবার জন্যে মাথাটা একবার মোটে নাড়তে চাইল চন্দন, কিন্তু অনেকবার নড়ে গেল। বুঝতে পারল ভেতরে ভেতরে সে ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এত নার্ভাস যে, নিজের শরীরের ওপর পর্যন্ত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তার। প্রায় অকারণে একটা ঢোঁক গিলে ফেলল। লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ?"

"টাট্‌-টাটা।"

"স্কুলে পড়ো ?"

"হ্যাঁ।" বলে আবার বারকয়েক মাথাটা নেড়ে দিল সে।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কোথাকার স্কুল ? ঘাটশিলার ?"

"নান্‌ না। ক-ক-কলকাতার। আমাদের স্কুল কলকাতায়। আমরা ঘা-ঘা-ঘাটশিলায় বে-বে-বেড়াতে এসেছি। স্যা-স্যা-স্যার আজ সকালে আমাদের টা-টা-টাটায় নিয়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা ! তাই বলো ! সারাদিন টাটায় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধেবেলা বাঙ্কে উঠে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আর তোমার বন্ধুরা বেমালুম তোমাকে ডাকবার কথা ভুলে গিয়ে ঘাটশিলায় নেমে পড়েছে। তাই না ?"

"হ্যাঁ। তা-তা-তাই।"

"কী করবে এখন তুমি ?"

"কী ক-ক-করব বলুন তো ?"

লোকটা চট্‌ করে কোনো উত্তর দিল না। নিজের পুরু ভারী ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। লোকটার হাতের আঙুলগুলোও বেশ মোটা এবং থ্যাবড়া। বাইরের দিকে এমন নিশ্চিন্তে তাকিয়ে বসে রইল যেন কামরার মধ্যে কোনো ঘটনাই ঘটেনি। অবশ্য কয়েক মিনিট। একটু পরে কোলের ওপর রাখা বিশাল ইংরেজি বইখানা মুড়ে পাশে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল।

এতক্ষণ লোকটার দিকে ভাল করে তাকানোর সময় পায়নি চন্দন। কিন্তু এখন, লোকটা যখন খুব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাচ্ছে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দনের মনে হল, লোকটাকে সে আগে কোথাও দেখেছে। ভীষণ চেনা মুখ। নিশ্চয়ই দেখেছে। কিন্তু মনে করতে পারল না সেই দেখাটা কোথায় এবং কখন হয়েছিল।

লোকটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আনমনে বলল, "গাড়ি আছে অনেক ফেরবার। রাঁচি, রাউরকেল্লা, কিন্তু···।" থেমে গিয়ে তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় উঠেছ তোমরা ঘাটশিলায় ?"

"বি-বি-বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে, দা-দা-দাহিগড়ায় একটা হোটেল আছে···।"

"উঁহু, তাহলে তো হবে না।" বাধা দিয়ে লোকটা বলে উঠল, "স্টেশন থেকে অনেক দূর, রাত্তির দেড়টা দুটোয় নেমে একলা অত রাস্তা তুমি যেতে পারবে না। রাতটা তোমাকে ঝাড়গ্রামেই কাটাতে

হবে।"

"ঝা-ঝা-ঝাড়গ্রামে ?"

"হুঁ, গাড়ি থাকলেও এই রাত্রে একা তোমার পক্ষে ফেরা অসম্ভব। কাল ভোরে ফিরতে হবে। খড়্গপুর টাটা লোকালে।"

"ঝাড়গ্রামে কো-কো-কোথায় থাকব ?"

গাড়ির স্পিড কমে আসছিল। এক মুহূর্ত বাইরেটা দেখে নিয়ে, লোকটার কোনো উত্তর না পেয়ে চন্দন আবার জিজ্ঞেস করল, "কো-কো-কোথায় থাকব ঝাড়গ্রামে ?"

"ওয়েটিংরুমে থাকতে পারতে। আমি বলে দিলে ওরা তোমায় ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুম খুলে দেবে।"

"দি-দি-দিন না বলে তাই।"

"কিন্তু বেশি রাত্রে এদিকে খুব ঠাণ্ডা পড়ে যে। তোমার গায়ে তো শুধু একটা পাতলা জামা।"

"হ্যাঁ। তাই কী-কী-কী হয়েছে ?"

"ওয়েটিংরুমে থাকলে ঠাণ্ডায় তুমি জমে যাবে।"

"তা-তা-তাহলে ?"

"আর একটা কাজ করতে পারো। আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যেতে পারো। যাবে ?"

"আপনার বা-বা-বাড়িতে ?"

"হ্যাঁ। রাতটা কাটিয়ে কাল ভোরে এসে ট্রেন ধরবে।" বেঞ্চ থেকে মোটা বইখানা হাতে নিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল। "তোমার আপত্তি আছে নাকি ?"

"নান্-না। কি-কি-কিসের আপত্তি ?"

"তবে আর বসে কী হবে ? উঠে পড়ো। গাড়ি ঝাড়গ্রাম পৌঁছে গেছে।"

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল চন্দন। আর তখনই মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল তার। এতক্ষণ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কতবার ভেবেছে কোথায় দেখেছে এই মুখ ? কোথায় ? কিছুতেই মনে করতে পারেনি। এখন লোকটা যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি তার মনে পড়ে গেল, এই লোকটাই একটু আগে স্বপ্নে তাকে তাড়া করেছিল। হ্যাঁ। কোনো সন্দেহ নেই, এই লোকটা। সেই মাথাভর্তি এলোমেলো কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, একেবারে হুবহু সেইরকম দেখতে।

লোকটা তাড়া দিল। "দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এগোও।"

এগোবে কী, চন্দনের মনে হল তার পা দুটো লোহার থামের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। খুব যে ভয় পেয়ে গেল, তা নয়। কীরকম যেন বিমূঢ় হয়ে গেল ক'মুহূর্তের জন্যে। এমন আশ্চর্য ব্যাপার তার জীবনে আর কখনও ঘটেনি। স্বপ্নে-দেখা অচেনা মানুষটাকে এভাবে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেয়ে যেতে পারে, এটা ভাবতে পারছে না সে। মনে হলেই গাটা কীরকম ছমছম করে উঠছে। লোকটার মুখের দিকে তাকাতে আর সাহস হচ্ছে না। দরজার দিকে এগোতে এগোতে সে চট্ করে ঠিক করে ফেলল যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, লোকটার সঙ্গে তার বাড়ি পর্যন্ত সে যাবে না। রাত্রের গাড়িতে ঘাটশিলা না ফিরলেও এইখানেই কোথাও থাকবে।

খুব বেশি লোক নামল না। বেশি হলে দশ-বারোজন। প্লাটফর্ম এদিকের আর পাঁচটা প্লাটফর্মের মতোই নিচু। মাঝখানে স্টেশন বিল্ডিং। স্টেশনের আলো তেমন উজ্জ্বল নয়। গাড়ির আলোর মতোই মরা মরা। সেই মরা আলোয় নির্জন প্লাটফর্ম দিয়ে স্টেশন

বিল্ডিংয়ের দিকে এগোতে এগোতে ভয়ানক শীত করতে লাগল চন্দনের। সে বুঝতে পারল, মধ্যরাত্রি নয়, এখানে এখনই বেশ ঠাণ্ডা। আজ হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে। হু হু করে কনকনে উত্তরের বাতাস বইছে। জানলার কাঁচগুলো নামানো ছিল বলে গাড়ির মধ্যে বোঝা যায়নি। নামতেই ঠাণ্ডা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

ফলে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হল তাকে। একটু আগে সে ঠিক করেছিল লোকটার সঙ্গে তার বাড়ি যাবে না। এই স্টেশনেই যেভাবে হোক রাতটা কাটিয়ে দেবে। এখন কিন্তু আর সে-কথা ভাবতেও সাহস পাচ্ছিল না চন্দন। বুকের ওপর দু'হাত আড়াআড়ি করে দিয়ে শীতে নিজের দু'কাঁধ চেপে ধরল সে। মনে মনে ভাবল, যা হয় হোক গে। লোকটার সঙ্গে সে লোকটার বাড়িতেই যাবে। ভাবতে এখন আর একটুও ভয় করল না তার। বরং গাড়ির মধ্যে ভয় পাওয়াটাকেই ছেলেমানুষি বলে মনে হল। স্বপ্ন কখনও ফলে? লোকটা কি দেবতা যে স্বপ্নে তাকে দেখা দেবে? সে মোটেই বাচ্চা ছেলে নয়। নাইনে পড়ে। একটা লোক স্বপ্নেও দেখা দেবে আবার নীচে বসে বইও পড়বে, এ কখনও হয় না। ঘটনাটাকে এইরকম করে ভাবতে পেরে চন্দনের বেশ ভাল লাগল।

টাটানগরে তাদের গাড়ি ছিল পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে। মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে এক নম্বর থেকে ওভারব্রিজ পার হয়ে তারা পাঁচ নম্বরে গিয়েছিল। তারপর ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একেবারে ইঞ্জিনের পরের গাড়িটা। ফলে এখন ঝাড়গ্রামে নেমে অনেকখানি হাঁটতে হল। তারা যখন গেটের কাছে এল তখন

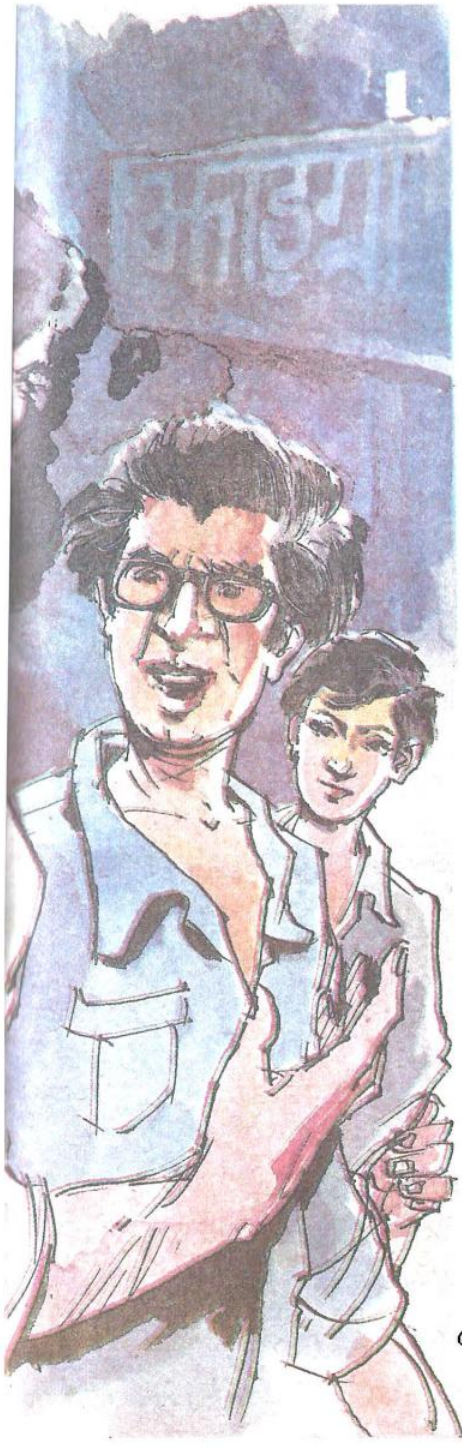

প্লাটফরমে আর দ্বিতীয় যাত্রী নেই।

টিকিট কালেক্টার একটু দূর থেকে লোকটাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে বলল, "আরে! ডাক্তারবাবু, আপনি! কোথায় গেছলেন?"

লোকটা হেঁটে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "একটু টাটায় গেছলাম ভাই।"

"অনেকদিন বাদে দেখলাম আপনাকে। কখন গেছলেন? ভোরের ট্রেনে?"

"হ্যাঁ।"

"আর তো আসেন না এদিকে ডাক্তারবাবু। আপনার কাছে কিন্তু আমার একটা জিনিস পাওনা ছিল।"

লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বলুন তো?"

"একদিন মেস্‌মেরিজ্‌ম করে দেখাবেন বলেছিলেন, দেখাননি।"

"বলেছিলাম নাকি!"

"বাঃ! একবার? অন্তত বারকয়েক বলেছিলেন।"

"তাই? তাহলে চট্ করে আমার চোখের দিকে তাকান দিকি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাকা-ন। সরাবেন না চোখ। তাকান।" ঠিক সেই সময় গাড়িটা চলতে আরম্ভ করল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল চন্দন ক'মুহূর্তের জন্য। গাড়ির চলে যাওয়া, যেদিকে গাড়ি যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে গাড়ির আলোর প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল কটা শালগাছ, ক'মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে এই সব দেখল সে। তারপর মনের সঙ্গে যেই আবার সে ফিরে এল এখানে শুনল লোকটা বলছে, "যান। সোজা অফিসে গিয়ে আমার জন্যে এক গেলাস জল নিয়ে আসুন তো ভাই।"

চন্দন টিকিট কালেক্টারের মুখের দিকে

তাকিয়ে অবাক। এই ক'মুহূর্তেই মানুষটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ খোলাই আছে। কিন্তু সে-চোখে জেগে থাকবার কোনো লক্ষণ নেই। জল আনার আদেশ পেয়ে যেভাবে হেঁটে চলল অফিসঘরের দিকে, সে-ও মানুষ ঘুমিয়ে হাঁটলে যেমন করে হাঁটে সেইভাবে। টিকিট কালেক্টার অফিসঘরের মধ্যে ঢুকবে সেই সময় পেছন থেকে লোকটা চেঁচিয়ে বলল, "আচ্ছা। এক কাজ করুন। গেলাসে করে আনতে হবে না। জলের কুঁজোটাই নিয়ে চলে আসুন।"

এক মিনিট বাদেই দেখা গেল অফিসঘর থেকে কুঁজো হাতে বেরিয়ে সে এদিকে আসছে। হাঁটাটা সেই একই রকম। ঠিক যেন একটা ঘুমন্ত মানুষ। কাছে আসতেই লোকটা হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "মেসমেরিজ্‌ম দেখতে চেয়েছিলেন, তাই না? ভেবেছিলেন আমার সম্পর্কে এই গুজবটা মিথ্যে। ঠিক আছে, দেখুন মেসমেরিজ্‌ম।" একটু থেমে গলা পাল্টে আদেশের স্বরে বলল লোকটা, "কুঁজো উল্টে এবার জলটা নিজের মাথায় ঢেলে দিন তো ভাই।"

টিকিট কালেক্টারটা তাই করল। কোনো দ্বিধা করল না। এক মুহূর্তের জন্যে, চিন্তা করল না কিছু। কনকনে ঠাণ্ডা। কুঁজোটা মাথার ওপর তুলে অক্লেশে সবটা জল মাথায় ঢেলে দিল। অকল্পনীয় দৃশ্য। কালীপুজোর রাত্রে বলির পাঁঠাকে চান করাবার পর লোমটোম বসে গিয়ে যে অবস্থা হয় পাঁঠাটার, কোটফোট ভিজে গিয়ে টিকিট কালেক্টারের প্রায় সেই অবস্থা হল। গলা বেয়ে গায়ে জল লাগতে বলির পাঁঠার মতোই কাঁপতে লাগল সে। লোকটা বলল, "শখ মিটেছে? যান, এবারে সোজা কোয়ার্টারে চলে যান।" বলেই চন্দনের হাত ধরে একটা টান মেরে বলল, "চলে এসো চন্দন, আমরা পালাই। কেউ এসে পড়তে পারে।"

লোকটা হাত ধরে টান মেরে এমন গলায় পালাবার কথা বলল যে, চন্দনের বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। তার হঠাৎ মনে হল এরকম ঠাণ্ডার রাত্রে একটা লোককে গায়ে মাথায় কুঁজোর জল ঢালতে বাধ্য করাটা গভীর অপরাধের কাজ, নিষ্ঠুরতাও। ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। স্টেশনের অন্য কেউ দেখতে পেলে নিশ্চয়ই রেগে যাবে। লোকটার মারধোর খাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এবং সে যেহেতু লোকটার সঙ্গী, দু'চার ঘা তার পিঠেও পড়তে পারে। প্রায় মুহূর্তের মধ্যে এই চিন্তাটা তার মাথায় খেলে গেল। এবং বিনা বাক্যে লোকটার সঙ্গে দ্রুত হেঁটে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে।

লোকটাও আর কোনো কথা বলল না। রাস্তার ধারে অন্ধকার গাছতলায় একটা জিপ দাঁড়িয়ে। জিপটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক। বোঝাই যায় জিপের ড্রাইভার। চন্দনের হাত ধরাই ছিল। দ্রুত হেঁটে সেই জিপটার কাছে এসে থামল লোকটা। থেমে চন্দনকে বলল, "তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো।" চন্দন পেছনে উঠতে যাচ্ছিল। লোকটা তার জামা ধরে টেনে বলল, "পেছনে না। হাওয়া লেগে অসুখ করে যাবে। যা ঠাণ্ডা! সামনে ওঠো।"

সে মাঝখানে বসল। তার ডানপাশে ড্রাইভার, বাঁ পাশে লোকটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল গাড়ি। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই শহরের আলোকিত রাস্তা ছেড়ে গাড়ি চলতে লাগল গ্রামের উঁচু-নিচু অন্ধকার রাস্তায়। তখন সেই অন্ধকারের

মধ্যে এক মুহূর্ত আগে সাময়িক উত্তেজনায় হারিয়ে যাওয়া নিজেকে হঠাৎ ফিরে পেল চন্দন। এতক্ষণ ভাবনাচিন্তা করার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার। সেই অবস্থাটা এতক্ষণে ফিরে পেল। এবং ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম তার মনে হল সে কোথায় চলেছে। এই লোকটার সঙ্গে এখন যতখানি যাবে, কাল ভোরে গাড়ি ধরবার জন্যে ঠিক ততখানিই ফিরে আসতে হবে তাকে। এখন জিপে করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভোরে ? ভোরেও কি জিপ দেবে লোকটা ? না স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে আসতে হবে তাকে ? হেঁটে এসে কি সে ভোরের গাড়ি ধরতে পারবে ?

অন্ধকারে ভূতের মতো বসে বেশিক্ষণ এই সব ভাবতে ভাল লাগল না চন্দনের। দৃশ্য দেখা গেলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল, সেই অবস্থায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে পারে। কিন্তু এখন দু'পাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রায় একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটছে। ফলে কথা বলবার জন্যে ভেতরে ভেতরে বড্ড অস্থির হয়ে পড়ল চন্দন। "আচ্ছা, লোকটা কি কো-কো-কোয়ার্টারে ফিরলেই জ্ঞা-জ্ঞা-জ্ঞান ফিরে আসবে ?"

"কার কথা বলছ ?" অন্ধকারে ফিরে চাইল লোকটা। "টিকিট কালেক্টার ?"

"হ্যাঁ। টি-টি-টিকিট কালেক্টার।"

"মনে হয় এতক্ষণে ফিরে এসেছে।"

"সত্যি, আপনি ঐ কা-কা-কাণ্ডটা করলেন মে-মে-মেসমেরিজ্‌ম করে ?"

"তোমার সন্দেহ আছে ?"

"নান্‌-না। স-স-সন্দেহের ক-ক-কথা বলিনি।"

"তবে ?"

"আমি না ভা-ভা-ভাবতেই পারছি না। একবার শুধু ইস্কুলে ম্যা-ম্যা-ম্যাজিক খেলায় দে-দে-দেখেছিলুম, একটা লোককে হিপ্‌নো-টা-টাইজ্‌ করল। আর লোকটা অমনি মা-মা-মাটি থেকে তি-তি-তিন হাত ওপরে উঠে গেল। কি-কি-কিছুই মনে থাকল না। টি-টি-টিকিট কালেক্টারের থাকবে ?"

লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিসের কথা বলছ ? কী মনে থাকবে টিকিট কালেক্টারের ?"

"মা-মা-মাথায় জল ঢালার কথা ?"

"সাধারণত থাকে না, তবে খুব বেশি ভাইটাল ফোর্স থাকলে আলাদা কথা। সে অবস্থায় স্বপ্নের মতো একটা বিভ্রম লেগে থাকে স্মৃতিতে। মনে হয়ে কী যেন হয়েছিল। কী যেন," বলতে বলতে গাড়িটা লাফিয়ে উঠল। মনে হয় স্পিড্‌ব্রেকার ছিল। ড্রাইভার খেয়াল করেনি। লোকটা হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে চুপ করে গেল। আবার যেটুকু বলল, চন্দন সেটুকুরও সবটা শোনেনি। সে যখন মাথায় জল ঢালার কথা মনে থাকবে কিনা জিজ্ঞেস করল তখনই হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল তার। টিকিট কালেক্টার মাথায় কুঁজো উপুড় করে ঢালবার প্রায় পরক্ষণেই লোকটা তার হাত ধরে টান মেরে বলেছিল, "চলে এসো চন্দন। আমরা পালাই।" চন্দন! লোকটা তার নাম জানল কী করে ? গাড়িতে এত কথা হয়েছে, লোকটা একবারের জন্যেও তার নাম জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করল না, অথচ জানল কী করে ? ভেতরে ভেতরে এই ভয়ানক ব্যাপারটা তাকে এমন উত্তেজিত করে তুলল যে, লোকটার একটা কথাও কানে গেল না তার। তাই

গাড়ি ঝাঁকি খেয়ে স্পিডব্রেকার পার হবার সঙ্গে-সঙ্গে চন্দন বলে উঠল, "আপনি কি মা-মা-মানুষের না-না-নামও জানতে পারেন ?"

"তার মানে ?" অন্ধকারে ভুরু কুঁচকে ফিরে চাইল লোকটা।

"আপনি যে ব-ব-বললেন, চ-চ-চলে এসো চন্দন, আমরা পা-পা-পালাই, আপনি আমার না-না-নাম জানলেন কী করে ?"

"ও ! এই কথা !" মনে হল লোকটা অন্ধকারে হাসল। "গাড়িতে তোমার বন্ধুরা তোমার নাম ধরে ডাকেনি একবারও ?"

"ডে-ডে-ডেকেছে। কেন ডাকবে না ?"

"তা হলে ?"

"তা-তা-তাহলে কী ?"

"আমি তোমার নাম জেনে গেলাম।"

"আপনি আমার নাম জে-জে-জেনে গেলেন ?" বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল চন্দন, মি-মি-মিথ্যে কথা বলবার জা-জা-জায়গা পাননি ? ক-ক-কখনও হতে পারে না। আমার ব-ব-বন্ধুরা আমার না-না-নাম ধরে ডেকেছে টাটানগর টে-টে-স্টেশনে। আপনি তখন গা-গা-গাড়িতে ছিলেন না। আপনাকে আমি ফা-ফা-ফার্স্ট দেখি ঘু-ঘু-ঘুম ভাঙার পর।"

তার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে কোমল গলায় লোকটা বলল, "তুমি দেখনি বলে আমি টাটানগরে গাড়িতে ছিলাম না ?"

"ছি-ছি-ছিলেন ?"

"ছিলাম বই কী। তোমাদের খোপে ছিলাম না। খানদুয়েক খোপ ওপাশে ছিলাম।"

"তা-তা-তাই ?"

চন্দনের পিঠের ওপর মৃদু চাপড় মারতে মারতে লোকটা বলল, "আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয় আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি ? আমি একজন ডাক্তার। দেখলে তো কতদূরে স্টেশন, সেখানকার লোকজনও আমাকে চেনে।"

"ক-ক-কখন উঠে এলেন আমাদের এখানটায় ?"

"গাড়ি ছাড়বার একটু পরেই। ঘুমিয়ে পড়েছিলে কি না জানি না, তুমি তখন বাঙ্কের ওপর চোখ বুজে শুয়ে। নীচে তোমার বন্ধুরা হুল্লোড় করছে।" এক মুহূর্ত থামল লোকটা। "আমি মিথ্যে বলি না বটে, কিন্তু কখনও কখনও সত্য গোপন করাও এক ধরনের মিথ্যাচার। গাড়িতে এমন কিছু ঘটেছিল যা তুমি জানো না। ব্যাপারটা তোমার বোধবুদ্ধির বাইরের। এতক্ষণ সব গোপন রেখেছিলাম আমি। কিন্তু সেই অপরাধে তুমি যদি আমাকে মিথ্যাচারী ভেবে বসো, তাই এখন আমি তোমাকে সব বলব ঠিক করেছি।"

ভেতরে ভেতরে অসম্ভব ভয় পেয়ে গিয়ে চন্দন বলল, "কী ঘ-ঘ-ঘটেছিল গাড়িতে ?"

"তোমার বন্ধুরা সত্যি-সত্যি তোমার কথা ভুলে গিয়ে ঘাটশিলায় নেমে যায়নি। আমি তাদের ভুলে যেতে বাধ্য করেছিলাম।"

যেমন করে স্পিড্‌ব্রেকারের ওপর জিপটা লাফিয়ে উঠেছিল, তেমনি করে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল চন্দনের। সে অবাক হয়ে বলল, "আপনি বা-বা-বাধ্য করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। হিপ্‌নোটাইজ্‌ করে তোমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলাম।"

"এক সঙ্গে ওই অত

ছে-ছে-ছেলেকে ?"

"অত কোথায় ? এখানে তো তোমার মোটে চার-পাঁচজন বন্ধু ছিল। কামরার অন্য খোপে যারা বসে ছিল, তারা তোমার কথা ভাবতে যাবে কেন ? তুমি যে বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়েছ, তাই হয়তো তারা জানে না।"

"কি-কি-কিন্তু কেন এ কাজ ক-ক-করলেন আপনি ?"

"তোমাকে আমার ভীষণ দরকার, তাই। তুমি আমার কাছে যে কতখানি মূল্যবান, সে তুমি ধারণা করতে পারবে না।"

"মু-মু-মূল্যবান !"

"নিশ্চয়ই। জায়গা ছেড়ে উঠে এসে তোমাদের খোপের সামনে আমাকে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, জানো তুমি ? বসবার জায়গা পাইনি। তোমার বন্ধুরা ঘাটশিলায় নেমে গেলে তবে বসতে পাই। তোমার মতো একটি ছেলে আমি একমাস ধরে খুঁজছি, তাই কোনো চান্স্ নিইনি। ঘাটশিলা পর্যন্ত সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসেছি।"

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ চন্দনের। কোনোরকমে সে বলল, "আমাকে নিয়ে কী ক-ক-করবেন আপনি ? কী করবেন ?"

"আমি তোমার তোতলামি ভাল করে দেব। আমি একটা ওষুধ বার করেছি। একটা ইন্‌জেকশান। ইন্‌জেকশানটা দিলেই তোতলামি ভাল হয়ে যাবে তোমার। শুধু একটা রাত্রির কষ্ট। কাল সকালেই তোমায় জিপে করে ঘাটশিলায় পৌঁছে দেবে আমার লোক।"

এই ব্যাপার ! চন্দনের মনে হল প্রবল জ্বরের পর তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে। কী ভয়টাই না সে পেয়েছিল। কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা তার উপকার করতেই চায়। তাহলে এত সব রহস্যময় কাণ্ডকারখানা কেন ? কেন এসব হিপ্‌নোটিজ্‌ম-টিপনোটিজ্‌ম করতে গেল লোকটা। তারা ঘাটশিলায় কোথায় আছে জেনে নিয়ে সোজা কাল সকালে ঘাটশিলায় গিয়েই তো তাকে ইন্‌জেকশানটা দিয়ে দিতে পারত। এই সব কাণ্ডের কী মানে ? হতে পারে ডাক্তার, কিন্তু লোকটা যে একটু ছিটিয়াল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকল না চন্দনের। ছিটিয়াল না হলে কারও ভাল করতে চেয়ে কেউ এত সব কাণ্ড করতে পারে ?

অনেক উত্তেজনার পর শরীরটা এমন হালকা লাগল চন্দনের যে, সে আর একভাবে বসে থাকতে পারল না। গিয়ারের ডাণ্ডা সামলে হাত-পা টান করে একটু আড়মোড়া ভাঙল সে। একটা হাই তুলতে তুলতে বলল, "ওষুধটা প-প-পরীক্ষা করতে চান আমার ওপর, তা-তা-তাই না ?"

"এগ্‌জ্যাক্টলি।"

"কা-কা-কাছাকাছি কোনো ছেলে পেলেন না ? এত কা-কা-কাণ্ড করে আমাকে আনতে হল ?"

"বললুম তো একমাস ধরে খুঁজছি আমি। পাইনি। আসলে পৃথিবী থেকে রোগটা ক্রমশ চলে যাচ্ছে। আমাদের ছোটবেলাতেও অনেক তোতলা ছেলে দেখেছি। আজকাল আর দেখা যায় না।"

"আপনি তো ডা-ডা-ডাক্তার। এর কি কোনো বি-বি-বিশেষ কারণ আছে ?"

"তোতলামি চলে যাওয়ার কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ।"

"থাকতে পারে। জানি না। মানুষের

কথা বলার ব্যাপারটা একটা জটিল প্রক্রিয়া। তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ?"

"নাইনে প-প-পড়ি।"

"ইতিমধ্যেই পড়েছ কিনা জানি না। তবে তোমাদের লাইফ সায়ান্সে নিশ্চয় ব্যাপারটা আছে। কথা বলার উৎস হল সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক। এর আয়তন কুড়ি হাজার বর্গ মিলিমিটার। দেখতে অনেকটা ধূসর রঙের। চোদ্দ শো কোটি কোষ দিয়ে তৈরি। সেরিব্রাম আবার নানা অংশে বিভক্ত। কোনো অংশকে বলে জাইরাস, কাউকে সালকাস। কেউ ফ্রন্টাল লোব্, কেউ অক্সিপিটাল। এদের অনেক রকম কাজ। একজন যদি পেশী-সঞ্চালনের জন্যে দায়ী হয়, তো অন্যজন অনুভূতির। বাক্ বা কথা বলার উৎস বলা যেতে পারে সেরিব্রামের টেম্পোরাল লোব্‌কে।"

"আমরা এসব প-প-পড়িনি এখনও।"

"পড়বে। এখন ব্যাপারটা শোনো, আমরা যদিও টেম্পোরাল লোব্‌কে কথা বলার জন্যে দায়ী করছি, আসলে কিন্তু গোটা মস্তিষ্কই এতে অংশ নেয়। আর এই জন্যেই ব্যাপারটা জটিল। এই যে আমি কথা বলছি বা আমার গলার স্বর ফুটে উঠছে, এর পেছনে কমপক্ষে পাঁচ ধরনের পেশীর ক্রমাগত সঞ্চালন কাজ করছে। সেগুলো হল শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত পেশী, ল্যারিংস্, জিভ, ফ্যারিংস্, চোয়াল এবং ঠোঁটের পেশী। তার মানে আমাদের কথা বলার ব্যাপারটা, যা যা বললাম, সেই সব অংশগুলোর সমন্বয়-সাধনের ফল। এই সমন্বয়ে যদি ত্রুটি থাকে, তাহলেই মানুষ তোতলা হয়। তোতলামিও আবার অনেকরকমের। ভার্বাল। যার উদাহরণ তুমি। কথা আটকে যাচ্ছে। সিনট্যাক্টিক্যাল। এদের কথা আটকায় না। কথা গুলিয়ে যায়। আমি যদি বলি, "আমি কলকাতায় খেলা দেখতে যাব", এরা বলবে, "আমি খেলা যাব।" এছাড়া আছে নমিনাল, সেমান্টিক। যাকগে। এসব তোমার মাথায় ঢুকছে না মনে হচ্ছে। ভালও লাগছে না নিশ্চয়। ক্লাসে বসে আছি মনে হচ্ছে, তাই না ?"

চন্দন অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে বলল, "নান্-না। স-স-সত্যি, বিশ্বাস করুন, আমার খু-খু-খুব ভাল লাগছে।"

"আ-চ্ছা !" চন্দনের পিঠে হাত রাখল লোকটা, "তুমি খুব ভাল ছেলে। ক্লাসে স্ট্যাণ্ড্ করো ?"

"সে-সে-সেকেণ্ড হই। পার্থটার সঙ্গে পা-পা-পারি না। ও ফাইভ থেকে বরাবর ফার্স্ট।"

"কোন্ ছেলেটা পার্থ বলো তো ? তোমার খোপে ছিল ?"

"হ্যাঁ। আমার খো-খো-খোপে ছিল। আপনি দে-দে-দেখেছেন। ল-ল-লম্বা মুখ, কোঁকড়ানো চুল, চো-চো-চোখে চশমা।"

"দেখেছি।

"হেভি ব-ব-বড়লোকের ছেলে।"

"তাই নাকি ? আর তুমি ?"

"আমি ?" হঠাৎ কীরকম বিমর্ষ হয়ে গেল চন্দন। "আমরা ব-ব-বড় লোক না। আমার বাবা নেই।"

"বাবা মারা গেছেন ?"

"নান্-না। মা-মা-মারা যাননি, নিরুদ্দেশ।"

লোকটা চট্ করে কোনো কথা বলতে পারল না। চন্দন বুঝতে পারল তার কথা শুনে লোকটা অবাক হয়েছে। এইটা সে আগেও দেখেছে। তার বাবার কথা শুনলে সবাই অবাক হয়ে যায়। দু'মুহূর্ত বোবা হয়ে গিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে তার

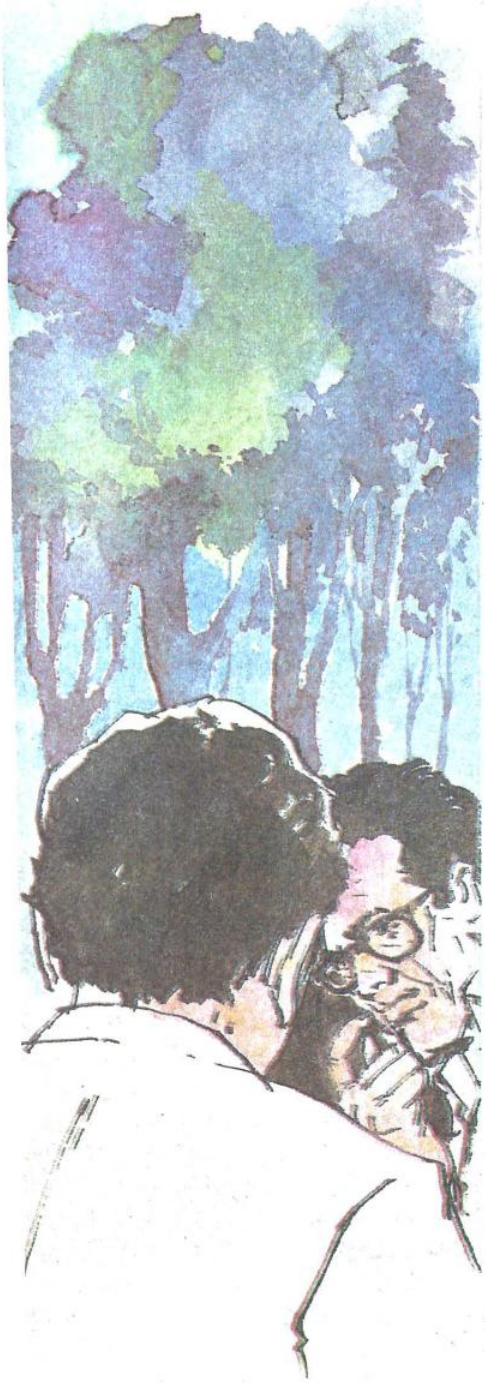

মুখের দিকে। তাদের জিপ এখন জঙ্গল দিয়ে ছুটছে। দিনের বেলা হলে চমৎকার লাগত। রাত্রে তেমন বোঝা যাচ্ছে না কিছু। শুধু কল্পনা করেই রোমাঞ্চ লাগছে যে, তার চারপাশ জুড়ে বিশাল বিশাল গাছ।

লোকটা তার পিঠে হাত রেখে দু'বার মৃদু চাপড় মারল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোমার মা চাকরি করেন ?"

"হ্যাঁ। ক-ক-করেন। স্কুলে।"

"বড় হবার পর বাবাকে দেখেছ তুমি ?"

"কো-কো-কোনোদিন দেখিনি।"

"বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে না তোমার ? কষ্ট হয় না বাবার জন্যে ?"

"কী-কী জানি ! ক-ক-কষ্ট হলেই বা পাব কোথায় বাবাকে ?"

"তাহলে তো তোমার ভারী কষ্ট।" লোকটা সিধে হয়ে উঠে বসল। "এবার আমরা নামব। এসে গেছি।"

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে এসে থেমে গেল। বিশাল গেট। জায়গাটা জঙ্গলের মধ্যেই। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

চারদিক থেকে জঙ্গলের নিজস্ব শব্দগুলি শোনা যেতে লাগল। ঝিঁঝির ডাক। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সরসর করে কিছু চলে যাবার শব্দ। সবুজ পাতাদের ফিসফিসানি। সব কিছু ছাপিয়ে পাঁচিলের অনেক ভেতর থেকে একটানা চাপা একটা মেশিন চলার শব্দও শোনা গেল। এই মেশিনের শব্দটাই খুব অবাক করল চন্দনকে। এমন গভীর জঙ্গলের মধ্যে মেশিন চলছে কেন ? সে জিজ্ঞেস করল, "কি-কি-কিসের শব্দ ওটা ?"

"জেনারেটারের শব্দ।" লোকটা বলল, "আমার জেনারেটার চলছে।

এখানে লাইট আসেনি তো।"

"আপনি জে-জে-জেনারেটার চালিয়ে লাইট জ্বালেন ?"

"হুঁ। কিন্তু দরজা খুলছে না কেন ?" বলে চিন্তিত মুখে লোকটা ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, "জগদীশ, হর্নটা বাজাও একবার।"

জগদীশ লোকটা অদ্ভুত। সর্বক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে এসেছে। একটাও কথা বলেনি। এখন লোকটার হুকুম শুনে হর্ন বাজাল। জঙ্গলের স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে ভীষণ শব্দ হল হর্নের। হর্ন বাজিয়ে ড্রাইভার বলল, "নেমে গিয়ে বেলটা বাজাব ?"

"বেল বাজবে না।" লোকটা বলল, "সকালে বেরোবার সময় আমি ডিস্‌কানেক্ট করে দিয়ে গেছি।"

লোকটার কথা শেষ হল না। তার আগেই বিশাল স্টিলের দরজা শব্দ করে নড়ে উঠল। একটা অদ্ভুত ঝনঝন শব্দ হতেই থাকল, আর সেই সঙ্গে দরজার পাল্লা দুটো খুলতে লাগল একটু করে। বেশ বোঝা গেল দরজা কেউ হাত দিয়ে খুলছে না। কোনো মেশিনের কারসাজিতে আপনি খুলে যাচ্ছে।

দরজা সবটা তখনও খোলেনি, জিপ স্টার্ট করল জগদীশ ড্রাইভার।

গাড়ি ভেতরে ঢুকতেই হঠাৎ কীরকম গা ছমছম করে উঠল চন্দনের। ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্পষ্ট শুনতে পেল, শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অমনি গা ছমছম করে উঠল তার। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকল। কেউ যেন বলে উঠল, "এ দরজা আর খুলবে না। পাঁচিল-ঘেরা এই দুর্গের মধ্যে সারা জীবনের জন্যে বন্দী হয়ে গেলে তুমি। বুঝতে পারনি এখনও চন্দন, লোকটা মোটেই সুস্থ না। পাগল।" কথাগুলো টেপ রেকর্ডার বাজবার মতন বুকের মধ্যে অবিরাম বেজে যেতে লাগল। জিপের মধ্যে শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে বসে থাকল চন্দন।

পিচের মসৃণ রাস্তা দিয়ে প্রায় শব্দহীন গড়িয়ে যাচ্ছিল জিপটা। হঠাৎ বিকট শব্দে ব্রেক কষে থেমে গেল। বিরাট ঝাঁকি লাগল। সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ল চন্দন। হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে তেমন আঘাত লাগল না। ব্রেক কষে ড্রাইভার হর্ন বাজাতেই সামনের দিকে তাকিয়ে তার চক্ষুস্থির। রাস্তা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ বসে আছে। মুখের ওপর আলো পড়ায় জ্বলজ্বলে দু'চোখ তুলে তাকিয়ে আছে এদিকে।

বাঘ যে কোনোদিন দেখেনি চন্দন, তা নয়। দেখেছে। তবে সে চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে। এমন রাস্তার ওপর ছাড়া বাঘ এই প্রথম। ফলে বোকার মতন ভয়ানক কাণ্ড করে বসল সে। হঠাৎ দু হাতে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে "বা-আ-আ" বলে চিৎকার করে উঠল। ভয়ে বাঘ কথাটা সম্পূর্ণ উচ্চারণ করার সাধ্যও থাকল না। বুড়ো মানুষের যেমন চোয়াল আটকে যায়, "বা-আ-আ" বলতে বলতে তেমনি চোয়াল আটকে গেল তার। লোকটার পিঠের ওপর মুখ গুঁজে শব্দটা করেই যেতে থাকল সে।

লোকটা তাকে ছাড়বার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আরে ! এমন ভয় পেলে কেন ? এটা আমার পোষা বাঘ। ছাড়ো ছাড়ো। উঠে বোসো। তাকিয়ে দ্যাখো, জগদীশ নেমে গিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিচ্ছে। মহা মুশকিল ! এই বাঘটা একটা গোরুর চেয়েও নিরীহ। একটা গোরুকে যতখানি ভয় পাও, ততখানিও ভয় পাবার

দরকার নেই এটাকে।"

লোকটাকে ছেড়ে চন্দন উঠে বসে সামনের দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। দেখল জগদীশ ড্রাইভার নেমে গেছে। একটা কঞ্চি দিয়ে বাঘটাকে খোঁচা মারতে মারতে 'হ্যাট হ্যাট' করছে। যেমন করে রাস্তা জুড়ে বসে থাকা গোরু কিংবা মোষ তাড়ায় লোক, ঠিক সেইরকম।

বাঘটা একবার জগদীশ ড্রাইভারের দিকে, একবার গাড়ির দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়ল। তারপর চোখ বুজে হাই তুলল একটা। শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ে হেলতে দুলতে ডানদিকের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

গাড়ি ছাড়তে লোকটা বলল, "তুমি তো আচ্ছা ভিতু। আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে আছ তুমি। তোমার অত ভয় পাওয়ার কী ছিল?"

চন্দন নিজেও বুঝতে পারল না সত্যি সত্যি সে কেন অত ভয় পেল। তার মনে হল ভয়ের সবটাই বাঘ দেখে নয়। খুলে যাওয়া দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার সময় যে ভয়টা ছড়িয়ে পড়েছিল বুকের মধ্যে, বাঘ দেখে সেইটাই দশ গুণ বেড়ে গিয়ে এই লজ্জার কাঁণ্ডটা ঘটিয়ে দিল। ভেতরে এখনও ভয়ের কাঁপুনি। লজ্জা পাওয়া গলায় সে বলল, "বা-বা-বাঘটা যে পো-পো-পোষা, আমি জানি?"

"তা না জানলেই বা! তুমি তো আর একলা ছিলে না। এমনকী, বাইরেও ছিলে না। গাড়ির মধ্যে বসে আছ। ছিঃ ছিঃ! এত ভয় তোমার! তুমি তো একটা দিনও এখানে থাকতে পারবে না। এ বাড়িটাকে তো চিড়িয়াখানা বললেই হয়।"

"চি-চি-চিড়িয়াখানা!"

"হ্যাঁ। জন্তু-জানোয়ার নিয়েই তো আমার কাজ। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হরিণ, হাতি, কী নেই। আমার কাজই হচ্ছে জঙ্গল থকে জন্তু ধরে এনে তাদের স্বভাব পাল্টে দেওয়া। খুব ছোটবেলায় ধরে আনি আমি। একেবারে বাচ্চা অবস্থায়। তারপর ইনজেকশান দিয়ে, ফুড্ হ্যাবিট চেঞ্জ করে তাদের স্বভাব পাল্টে দিই। ওই যে বাঘটা দেখলে, ও জীবনে মাংস খায়নি।"

"তা-তা-তাহলে কী খায়?"

"গাছপালা, খড় খোল, ভুসি, ফ্যান।"

"স-স-সত্যি!"

"আমি তো তোমায় আগেই বলেছি আমি মিথ্যে বলি না। গোরুর খাবার খায় বলেই ওটা একেবারে গোরু হয়ে গেছে। দেখলে না কেমন কঞ্চি দিয়ে হ্যাট হ্যাট করতেই রাস্তা ছেড়ে উঠে চলে গেল। অথচ আমার এখানে এমন গোরু আছে, যে তোমাকে দেখবামাত্র বাঘের মতো তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ। শুধু গোরু কেন? হিংস্র হরিণও আছে এখানে।"

"কো-কো-কোথায় তারা?"

"ভীষণ মজবুত স্টিলের তৈরি খাঁচায়। তাদের কি ছেড়ে রাখা যায়?"

"তা-তা-তার মানে নি-নি-নিরীহ জন্তুদের আপনি হিংস্র করে তোলেন আর...।"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লোকটা বলল, "হ্যাঁ। আর হিংস্র জন্তুদের নিরীহ। তোমার মজা লাগছে না শুনে?"

চন্দন মুখে বলল, "হ্যাঁ। লা-লা-লাগছে।" কিন্তু মনের ভেতরে সে কোনো মজা খুঁজে পেল না। ব্যাপারটাকে তার এক ধরনের পাগলামি মনে হল। আর লোকটাকে পাগল।

একটা ঝিলের পাশ দিয়ে এসে গাড়ি একটা বাড়ির সামনে থামল। জঙ্গল শেষ হয়ে ঝিল। তারপর এই বাড়ি। বিশাল বাড়ি। ইতিহাস-বইতে দেখা অবিকল কোনো দুর্গের মতন। মনে হল ওপরে নীচে মিলিয়ে বাড়িটায় অসংখ্য ঘর।

লোকটা জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকল, "নেমে এসো চন্দন। এই আমার বাড়ি।"

চন্দন নেমে এল। এতক্ষণ গাড়ির মধ্যে ছিল বলে বোঝা যায়নি, নামতেই কনকনে ঠাণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কেঁপে উঠল সে। ঝাড়গ্রাম স্টেশনে ট্রেন থেকে নামবার পর যেভাবে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রাখতে হয়েছিল, এখানেও তাই করতে হল।

ঢুকেই প্রথমে বড় একটা হলঘর। তারপর চওড়া বেশ বড়সড় সিঁড়ি। লোকটার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হল চন্দনকে। অনেক ঘর, অনেক দরদালান পেরিয়ে তারা একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরের সামনে এল। সেই ঘরের মধ্যে তাকে ঢুকতে হুকুম করে লোকটা বলল, "এই তোমার ঘর। এখানেই রাত্রে থাকবে তুমি। সারাদিন বেড়িয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই। বিশ্রাম করো। আমি বেদানাকে দিয়ে তোমার জন্যে গরম দুধ খানিকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। দরকার মনে করলে ঘন্টাদুয়েক ঘুমিয়ে নিতেও পারো।"

চন্দন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঘু-ঘু-ঘুমোব ?"

"হ্যাঁ। ঘুমিয়ে নাও। এ বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতে রাত হয়। সাড়ে এগারোটা বারোটার আগে হবে না। আমারও কিছু কাজ আছে। সেই সব সেরে আমি আসছি।"

লোকটা হাত নেড়ে লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকল চন্দন। ঘরটা লম্বা প্যাটার্নের। খুব বেশি জিনিসপত্র নেই। একটা খাট। খাটে পরিপাটি করে বিছানা পাতা। পায়ের কাছে কম্বল ভাঁজ করা।

বাথরুমে ঢুকে শুকনো তোয়ালে দেখে তার খুব হাত-মুখ ধুতে ইচ্ছে করল। সুসজ্জিত বাথরুম। বেসিন, কমোড্, সব ঝকঝক করছে। মাথার ওপর শাওয়ার। কল খুলে সে হাত-মুখ ধুল। শুকনো তোয়ালে দিয়ে জল মুছে সে একেবারে খাটে উঠে পড়ল। কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে আধশোওয়া হয়ে গেল বিছানায়। হ্যাঁ। লোকটা ঠিকই বলেছে, তার এখন কিছু খাওয়া উচিত। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। টাটা স্টেশনে ভাত খেয়েছে একটার সময়, আর এখন কটা কে জানে ! দশটা, সাড়ে দশটা হবে নিশ্চয়ই। বেশিও হতে পারে। এক গেলাস গরম দুধ পেলে মন্দ হবে না।

ঘাটশিলার কথা মনে পড়ল তার। পার্থরা ভাবতেও পারছে না বিশাল বাড়ির একটা ঘরের মধ্যে কম্বল গায়ে দিয়ে সে শুয়ে আছে। আরও মজা হবে যখন সে ফিরে গিয়ে মেসমেরিজমের কথা বলবে। ওরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। পার্থটা মাথা নেড়ে বলবে, 'অসম্ভব। কার ঘাড়ে কটা মাথা আমাদের ভুলে যেতে বাধ্য করে ? আমরা এমনিই ভুলে নেমে পড়েছি।' তারপর যখন দেখবে তার তোতলামি ভাল হয়ে গেছে, তখন বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না। সত্যি ! এরকম অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা শুধু গল্পের বইতেই পাওয়া যায়।

বারান্দায় পায়ের শব্দ হতেই উঠে

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান—যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমং বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন। | নেস্টাম মিশিয়ে নিন। | এবার খেতে দিন।

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম

বেবি সিরিয়াল

দুধের সঙ্গে মেশান

NESTLÉ

SAA/FSL/N:3150 BEN

বসল চন্দন। সে ভেবেছিল বেদানা তার জন্যে দুধ নিয়ে এসেছে। বেদানা ! ভারী মজা লাগল তার। বেদানা আবার কারও নাম হয়। কিন্তু বেদানা এল না। তার দরজার সামনে দিয়ে তিনটে ছেলে বারান্দার যে দিকে লোকটা গিয়েছিল সেদিকে চলে গেল। তিনজনেই তার বয়সী। তার বয়সী ছেলে এ-বাড়িতে কোত্থেকে এল ভেবে খুব অবাক হয়ে গেল সে। তিনজনের হাতেই জিনিসপত্র। প্রথমজন নিয়ে গেল একটা রেকর্ড প্লেয়ার। পার্থদের বাড়িতে দেখা আছে বলে চিনতে অসুবিধে হল না। দ্বিতীয় ছেলেটির হাতে ছিল এক বাক্স রেকর্ড। বাক্সটাই দেখল সে। রেকর্ড দেখেনি। তাহলেও ধরে নিল ওটা রেকর্ডের বাক্স। সব চেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড হল তৃতীয় ছেলেটির বেলায়। তার কাঁধে একটা দামি কার্পেট। হাতে ট্রের ওপর এক পট্ চা আর কাঁচের গেলাস। গেলাস একটাই। তার খুব মজা লাগল। পটভর্তি চা, এদিকে গেলাস মোটে একটা। আবার কাপ নয়, গেলাস। লোকটা কি কার্পেট পেতে বসে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে গেলাসে করে চা খাবে ? কে জানে ? তাই খাবে হয়তো।

হঠাৎ সানাইয়ের ভারী মিষ্টি শব্দ ভেসে এল। বোঝা গেল রেকর্ড প্লেয়ারে একটা সানাইয়ের রেকর্ড চাপানো হয়েছে। এতক্ষণ অনেক দূর থেকে আসা জেনারেটারের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না বাড়িটায়। এখন সানাইয়ের আওয়াজে জেনারেটারের শব্দ চাপা পড়ে গেল।

সানাইয়ের আওয়াজে তন্ময় হয়ে হাঁটুর ওপর মুখ নামিয়ে বসে ছিল চন্দন। তাই বারান্দায় কোনো পায়ের আওয়াজ পায়নি। আচমকা টেবিলের ওপর ঠক করে শব্দ হতেই সে মুখ তুলে দেখল ঘরের মধ্যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পার্থর দিদির মতো। অত সুন্দর না। কিন্তু সেইরকম বয়সের। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে মেয়েটি বলল, "আমার নাম বেদানা। গরম দুধটা খেয়ে নাও। খেলে দেখবে তোমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। দুধ খেয়ে কর্তা তোমায় ঘুমিয়ে থাকতে বলেছে।" কথা শেষ করে দুধের গেলাসটা তুলে চন্দনের দিকে বাড়িয়ে দিল বেদানা। "নাও, ধরো।"

অদ্ভুত দেখতে মেয়েটাকে। মোটেই সুন্দরী না। রোগা রোগা হাত। গায়ের চামড়া কেমন খসখসে। কালো। তা সত্ত্বেও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। চন্দন দেরি করছে দেখে বেদানা আবার বলল, "কী হল ? ধরো।"

চন্দন গেলাস হাতে নিল। সে যখন দুধে চুমুক দিয়েছে, বেদানা একবার বারান্দায় চলে গেল। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে মুখে আঙুল তুলে চন্দনকে কথা বলতে মানা করল। আঁচলের তলা থেকে খাতা-পেন্সিল বার করে খসখস শব্দে কী যেন লিখল খাতায়। দুধ খাওয়া হয়ে যেতে গেলাসটা ফিরিয়ে নিয়ে খাতাখানা বাড়িয়ে দিল সে চন্দনের দিকে। চন্দন দেখল খাতায় বেশ বড় বড় করে লেখা আছে, "কথা বোলো না। যা বলবার লিখে দাও। তুমি কি তোতলা ?"

চন্দন অবাক হয়ে বেদানার মুখের দিকে তাকাল। বেদানা তৎক্ষণাৎ মুখে আঙুল তুলে তাকে কথা বলতে বারণ করল। তারপর শূন্যে লেখার ভঙ্গি করে খাতা দেখিয়ে ইশারায় লিখতে বলল।

চন্দন লিখল, "হ্যাঁ। আমি তোতলা। তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু কথা বলতে বারণ

করছ কেন ?"

বেদানা লিখল, "কর্তা কানে মেশিন বসিয়ে সানাই বাজাচ্ছে আর চা খাচ্ছে। কানে মেশিন থাকলে কোন্ ঘরে কী কথা হয় কর্তা সব শুনতে পায়। তোমার নাম চন্দন, তাই না ? তুমি এসে ভাল করোনি। বিপদে পড়ে গেছ। কোথায় পেল তোমায় কর্তা ?"

কীভাবে তাকে পাওয়া গেছে, সে-কথা লিখল চন্দন। তারপর লিখল, "বিপদ কিসের ? তোতলামি ভাল হয়ে গেলে কোন্ বিপদ ?"

বেদানা লিখল, "তোমার তোতলামি ভাল হবে না। এর আগে আটজন তোতলা ছেলে যোগাড় করে এনেছিল কর্তা। কিন্তু ইনজেকশান দিয়ে কারও তোতলামি ভাল করতে পারেনি। উল্টে তারা সকলেই কথা বলতে ভুলে গেছে। জিভ অসাড় হয়ে গেছে। তারা এখন এই বাড়িতে বন্দী। একবার এই বাড়িতে ঢুকলে আর কেউ বেরুতে পারে না।"

লেখাটা পড়ে ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল চন্দনের। সারা জীবনের জন্যে এই বাড়িটায় সে বন্দী হয়ে গেছে ভাবতেই কান্না পেয়ে গেল যেন। তার অবস্থা দেখে বেদানা তাড়াতাড়ি খাতা টেনে নিয়ে লিখল, "অত ভয় পেয়ো না। তুমি এই বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে আমরা তৈরি হয়েছি। ঠিক করেছি তোমাকে কিছুতেই ইনজেকশান দিতে দেব না। কর্তার ওপর আমরা সবাই চটে আছি। আজ সারাদিন আমাদের মিটিং হয়েছে। দেখনি দরজা খুলতে দেরি হয়ে গিয়েছিল !"

চন্দন লিখল, "হ্যাঁ, দেখেছি। দরজা খুলতে দেরি দেখে লোকটা অস্থির হয়ে উঠেছিল।"

"তখন মিটিং চলছিল আমাদের।" খাতা টেনে বেদানা লিখল, "হ্যাঁ, তখনও আলোচনা চলছিল। তারপর গাড়িতে তোমাকে দেখেই আমরা ঠিক করি তোমাকে সাহায্য করব। এই বাড়িতে আমাদের মতো যাতে তুমি বন্দী হয়ে না থাকো, তা দেখব।"

বন্দী থাকার কথা ভেবে চন্দনের চোখ ছলছল করে উঠল। সে লিখল, "বেদানাদি, তোমাকে লোকটা কোত্থেকে নিয়ে এসেছিল ? তুমি তো তোতলা ছিলে না। তোমাকে কেন এনেছিল ?"

"আমি তোতলা ছিলাম না। আমি মানুষও ছিলাম না।" খাতা টেনে খসখস করে লিখল বেদানা, আমি ছিলাম একটা ছোট্ট মেয়ে-বাঁদর। আমার যখন এক মাস বয়েস, তখন থেকে কর্তা আমাকে কাটাছেঁড়া করতে থাকে। ইন্‌জেকশান দেয়। ওষুধ খাওয়ায়। আমি আস্তে-আস্তে মানুষ হয়ে উঠি। দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন পুরোপুরি একটা মানুষ। কর্তা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, কথা বলতে শিখিয়েছে। কিন্তু হলে কী হবে ; আমার কোনো অতীত নেই। মানে মানুষের অতীত। কোনো ইতিহাস নেই। মানে মানুষের ইতিহাস। মানুষ বড় নিষ্ঠুর ভাই। অন্য মানুষকে দেখিনি। কর্তাকে দেখেছি। তার নিষ্ঠুরতার তুলনা হয় না। সমস্ত রকম স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করাই তার কাজ।"

লেখাটা পড়ে অবাক হয়ে গেল চন্দন। সে মুখ ফুটে বলতে যাচ্ছিল, "তুমি মা-মা-মানুষ না বেদানাদি ?" কিন্তু বলবার আগেই বেদানা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে দিল। খাতায় লিখল, "এই বোকা ছেলে, ভুলে যেও না, কর্তার কানে মেশিন আছে।"

খাতা টেনে নিয়ে চন্দন লিখল, "আমি ভাবতে পারি না তুমি একদিন বাঁদর ছিলে।"

বেদানা লিখল, "সে কী! সব মানুষেরই পূর্বপুরুষ তো বাঁদর। তুমি ভাবতে পারো না কেন?"

চন্দন লিখল, "তাহলে কী হয়? মাঝখানে যে হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাস? লোকটা কি কেবল নিষ্ঠুরতা করে বেদানাদি? ডাক্তারি করে না?"

"না। ডাক্তারি করে না।" বেদানা লিখল, "কর্তা বলে, রোগের ডাক্তারি করার জন্যে আমি জন্মাইনি। আমার ডাক্তারি হল খোদার ওপর খোদকারি।"

চন্দন লিখল, "তাহলে চ'লে কী করে? কোথায় টাকাপয়সা পায় লোকটা?"

"টাকাপয়সার অভাব কী?" বেদানা লিখল, এমনিতেই পূর্বপুরুষের বহু টাকা ছিল। তার ওপর নানারকম ব্যবসা করে সে-টাকা কর্তা অনেক বাড়িয়েছে। এখন যে সানাই বাজানো হচ্ছে, সেটা হাঁস-মুরগিদের জন্যে। বিশাল পোলট্রি। প্রায় হাজার-তিনেক হাঁস-মুরগি আছে। পোলট্রির পরেই আছে ডেয়ারি ফার্ম। সেখানেও আছে শ' তিনেক গোরু মোষ। রাত আড়াইটের সময় দুধ আর ডিম নিয়ে গাড়ি চলে যায় খড়গপুর। খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর। এক-একটা গোরু-মোষ তিরিশ-চল্লিশ কেজি করে দুধ দেয়। রোজ হাজার দুয়েক ডিম। তাহলে ভেবে দ্যাখো, কী পরিমাণ টাকা প্রতিদিন আয় করে কর্তা। আমি এবার চলে যাব চন্দন। আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না। কর্তা যাতে তোমাকে ইন্‌জেকশান দিতে না পারে, আর যাতে তুমি এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারো, তার ব্যবস্থা আমরা করব। তুমি ভেবো না। সময়মতো আমি এসে যাব তোমার কাছে।"

লেখাটা পড়তে পড়তে চন্দন একবার মুখ তুলে বেদানার দিকে তাকাল। এমনি তাকিয়েছিল। কিন্তু তাকিয়ে সে অবাক। বেদানার চোখমুখ কী রকম পাল্টে গেছে। একটু আগেও এরকম ছিল না। নাকের গর্ত দুটো দেখা যাচ্ছে। মুখ জুড়ে একটা কালচে ছাপ। কপালে রেখা ফুটে উঠেছে। খুব ভয় পেলে যেমন হয়, সেইরকম। কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ বুঝতে পারল না সে। চন্দনের মনে হল বেদানা কোনো বিপদের আঁচ পেয়েছে। মনে মনে সে নিজেও ভয় পেল। লেখাটুকু শেষ করবার জন্যে যেই সে খাতার ওপর চোখ রেখেছে, তৎক্ষণাৎ বিপদ ধরা পড়ল তার কাছে। বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দুধের গেলাস তুলে নিল হাতে বেদানা। তার সামনে থেকে ছোঁ মেরে খাতাটাও নিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু পারল না। তার আগেই দেখা গেল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাঁফাচ্ছে। গাড়িতে দেখা সেই শান্ত চেহারা আর নেই। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। ভারী লম্বা-চওড়া দশাসই লাগল লোকটাকে এখন। দু' চোখ লাল। কিন্তু কানে মেশিন নেই। হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, "তাহলে এই সব হচ্ছে? পাছে আমি শুনতে পাই, তাই খাতায় লেখালেখি। দেখি কী আছে খাতায়?" টান মেরে খাতাটা নিয়ে নিল লোকটা খাট থেকে। পাতা উল্টে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল লেখাগুলোর ওপর। সব যে পড়ল, তা নয়। কিন্তু দরকারি কথাগুলো ঠিক ঢুকে গেল মাথায়। শেষে খাটের ওপর একটা ঘুসি মেরে বলল, "বেদানা, তোকে

LINTAS.SU.267.1510 BG

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আমি খুন করে ফেলব। আমি তোকে মানুষ করেছি, আমিই তোকে শেষ করব। এতদূর স্পর্ধা, লিখেছিস ইন্‌জেকশান দিতে দিবি না! পালিয়ে যেতে সাহায্য করবি? দেখি কী করে আটকাস তুই? আমি এখুনি ওকে ইন্‌জেকশান দেব। আর তোকেও আগের মতো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখব আমি। যা এখান থেকে। যা।"

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল বেদানার মুখ। ঘুমন্ত মানুষের মতো গেলাস হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। তখন লোকটা ফিরে চাইল তার দিকে। সেই দৃষ্টির সামনে চন্দনের রক্ত যেন গলে জল হয়ে যেতে লাগল। মুহূর্তের জন্য মায়ের মুখখানা মনে পড়ল তার। মা যখন শুনবে ঘাটশিলায় বেড়াতে গিয়ে চন্দন চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে, মায়ের সেই তখনকার মুখ। ভয়ে দু' চোখ বুজে ফেলল চন্দন। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। বোধহয় দেড়-দু' মিনিট এই অবস্থায় কাটল। তারপর সে টের পেল তার দু' হাত কেউ শক্ত করে ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধছে। চোখ খুলে তাকাল সে। আর তক্ষুনি তার মনে পড়ল এই মুখ সে চেনে। লোকটার এই এলোমেলো ভয়ঙ্কর মুখ সে দেখেছিল ডিমনা লেকে। সে যখন বাঁধ দিয়ে ছুটছে, তার পেছনে ছুটে আসছিল এই মুখ।

শুধু হাতই বাঁধল না, লোকটা তার পা দুখানাও বাঁধল। বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া! আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া! থাক পড়ে। আসছি আমি ইন্‌জেকশান নিয়ে।"

লোকটা বেরিয়ে গেছে বুঝতে পেরেও চন্দন আর চোখ খুলল না। কী হবে চোখ খুলে? সে ধরেই নিল কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটা এসে তাকে ইন্‌জেকশান দেবে আর সে হয়ে যাবে এ-বাড়ির আর একজন ভৃত্য। আটজন ছিল, তাকে নিয়ে হবে ন'জন। জিভ অসাড় হয়ে যাবে। কথা বলতে পারবে না। কে জানে পুরনো স্মৃতিও থাকবে না হয়তো। শুধু খাবে, ঘুমোবে আর কাজ করবে। কাজ। গল্পের বইতে সে দেখেছে এইসব বিপদের মুহূর্তে ছেলেরা নিজের জোরে কত অসাধ্য সাধন করে। সে কিন্তু সেরকম কিছু ভাবতে পারছে না। এ-বাড়িতে নিজের জোরে কিছু করার চিন্তা অবাস্তব। দাঁত দিয়ে সে হাতের বাঁধন খুলে ফেলতে পারে। নিশ্চয়ই পারে। খোলা হাত দিয়ে পায়ের বাঁধনও। কিন্তু তারপর? বাইরের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভয়ানক সব হিংস্র জন্তু। হয়তো তারা আর হিংস্র নেই, কিন্তু তাদের চেহারা দেখলেই তো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। শেষে সেই স্টিলের গেট। সেটাও যদি সে দৈবক্রমে পার হয়ে যায়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত সেই আঠারো কুড়ি মাইল রাস্তা?

চোখে জল এসে গেল চন্দনের। কোনো শব্দ করল না। শুধু চোখ দিয়ে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্রমশ চেতনাও কী রকম অসাড় হয়ে আসছিল। তার মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়ছে। দুবার ঝাঁকি মেরে জেগে ওঠবার চেষ্টা করল। পারল না। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল। হাই উঠল দুবার। ভেতরের গভীর হতাশা একটু একটু করে তাকে ঘুমের মধ্যে ঠেলে দিতে লাগল।

ঠিক এই সময়, যখন সে ঘুম এবং জাগরণের সন্ধিক্ষণে হাবুডুবু খাচ্ছে, ঘরের মধ্যে পায়ের আওয়াজ পেল চন্দন। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো টানটান হয়ে

উঠল দেহ তার। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে উঠল। সে বুঝতে পারল ইন্‌জেকশান নিয়ে লোকটা ফিরে এসেছে। নিজেকে অসহায় ফাঁসির আসামির মতো লাগছিল। ফাঁসির আসামি চোখ বুজে যেভাবে পায়ের তলা থেকে কাঠের পাটাতন সরে যাবার অপেক্ষা করে, সেও যেন সেই রকম হাতের ওপর একটা ছুঁচ বিঁধে যাবার অপেক্ষা করছে। তীব্র, ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক সেই অপেক্ষা।

কিন্তু ছুঁচ বিঁধল না। তার মনে হল, কেউ কোনো ধারালো কিছু দিয়ে তার হাতের দড়ি কাটবার চেষ্টা করছে। চোখ খুলে ফেলল সে। দেখল বেদানা। বেদানা ঝুঁকে পড়ে তার হাতের দড়ি কাটছে। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল তার। মনে হল সেটা এখুনি বুকের খাঁচা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসবে। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। উঠে বসে বোকার মতো সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বেদানার দিকে। বেদানা ধমক দিয়ে বলল, "তুমি তো আচ্ছা বোকা ছেলে! বসে আছ যে! নামো। শিগগির চলো আমার সঙ্গে।"

চন্দন ভয় পেয়ে বলে উঠল, "তুমি এই ঘরে ক-ক-কথা বললে বেদানাদি?"

"ধ্যাত্! কিছু হবে না।" বেপরোয়া গলায় বেদানা বলল, "কর্তার কানে মেশিন নেই।"

"লো-লো-লোকটা কোথায় এখন?"

"লেবোরেটারিতে। ইন্‌জেকশান নিয়ে ব্যস্ত। দেরি করছ কেন? পালাও। দেরি করলে বিপদ হবে।" তার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারল বেদানা। "আর দেরি নয়। শিগগির।" দরজার দিকে ছুটল বেদানা। পেছনে চন্দন। ছুটতেই থাকল। ঘর থেকে ঘরে, দালান থেকে দালানে ছুটতে থাকল। বাড়িটার কিছুই চেনে না চন্দন। বেদানার পেছনে প্রায় অন্ধের মতো ছুটছিল সে। অদ্ভুত কাণ্ড। এত ছোটাছুটি হল, কিন্তু কোথাও কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হল না চন্দনের। শেষে বাড়ির একটা নোংরা, অন্ধকার জায়গায় পৌঁছে বেদানা থামল। হাঁফাচ্ছিল সে। সামনেই একটা সিঁড়ি। সিঁড়িটা খাড়া নেমে গেছে নীচে। এত নীচে যে, দেখা যাচ্ছে না কিছু। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বেদানা বলল, "আর যাব না আমি। এবার ফিরব।"

"সে-সে-সে কী!" চন্দনও হাঁফাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে অবাক হয়ে বলল, "আমি একলা কো-কো-কোথায় যাব বেদানাদি?"

"ভয় নেই। এটুকু তুমি একলাই পারবে। নীচে নামলেই দরজা পাবে একটা। দরজা খুলে একবার বাইরে বেরোতে পারলে আর তোমায় পায় কে?"

"কো-কো-কোন জায়গায় বেরোব?"

"কর্তার ডেয়ারি ফার্মের পেছনে।"

"সবে তো বাড়ির বা-বা-বাইরে বেরোলুম। তা-তা-তারপর? স্টেশন যাব কী করে?"

"দুধের গাড়ি করে। দরজা খুলে বাইরে বেরোলেই দেখতে পাবে কালো রঙের বিশাল দুধের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে ভেতরে। ওইটুকু তোমার ভাগ্য। রাত দেড়টা দুটোয় দুধ তুলবে। তোমাকে হয়তো তখন তারা অন্ধকারে না দেখতেও পারে।"

"আবার হয়তো পা-পা-পারেও, তাই

না ?"

"বললুম তো ওইটুকু তোমার ভাগ্য। যাও। কী হল ? নামো। আর দেরি কোরো না।"

কান্না পেয়ে গেল চন্দনের। অসহায় চোখে একবার বেদানার দিকে তাকিয়ে সিঁড়িতে পা দিল সে। পাতলা অন্ধকার চারদিকে। যেন সবে একটু একটু করে ভোর ফুটছে। আবছা দেখা যাচ্ছে সব কিছু। সিঁড়িটার ব্যবহার নেই। ধুলোর মোটা সর পড়ে আছে ধাপগুলোর ওপর। দ্রুতই নামছিল সে। কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছিল না। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, ছোটাছুটিই সার। তার নিষ্কৃতি নেই। দুধের গাড়িতে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। ধরা সে পড়বেই। আর ধরা পড়লে যে কী, তাও তো জানা। ইন্‌জেকশান, এবং তারপর আমৃত্যু দুর্গের মতো এই বাড়িটায় বন্দীর জীবন।

সিঁড়ি শেষ। সিঁড়ির শেষে খানিকটা চওড়া প্যাসেজ। আবর্জনার স্তূপ জমে আছে প্যাসেজের ওপর। বাঁ দিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেছে প্যাসেজটা। সেদিক থেকে ভ্যাপসা গন্ধ এসে লাগল নাকে। চন্দনের সামনে পুরনো আমলের বিশাল দরজা। অনেকটা উঁচুতে খিল। খিলে হাত দেবার জন্যে তাকে প্রায় আঙুলের ওপর উঠে দাঁড়াতে হল। দরজার গায়েও ধুলো। ধুলো আর ঝুল। খিলটা কিন্তু শক্ত নয়। ঠেলতেই উঠে গিয়ে খুলে এল। বুকের মধ্যে দুরদুর করে উঠল চন্দনের। দু' হাতে টেনে পাল্লা দুটো খুলে ফেলল সে। আর তৎক্ষণাৎ টর্চের তীব্র আলোয় দু'চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। কিন্তু বুঝে ওঠবার আগেই লোকটার গলা শুনতে পেল সে। বিদ্রূপ মাখানো ভয়ানক গলা। "পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল তাহলে ? চন্দনবাবু ! নিজেকে খুব চালাক মনে করো তুমি, তাই না ? যারা বোকা, তারাই শুধু নিজেদের চালাক মনে করে।" শব্দ করে হাসল লোকটা। টর্চ নিবিয়ে দিল। তখন লোকটাকে অন্ধকারে স্পষ্ট করে দেখতে পেল চন্দন। বিশাল দরজার সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাতে ঝকঝক করছে ছোট পিচকিরির সাইজের একটা সিরিঞ্জ। সিরিঞ্জের মুখে চার ইঞ্চি লম্বা সুঁচ।

অন্ধকারে লোকটাও এক মুহূর্ত দেখল তাকে। তারপর গলা কঠিন করে বলে উঠল, "কী ভেবেছিলে আমাকে ? গল্পের বইতে পড়া সেই ভীষণ মানুষদের একজন, তাই না ? তাই পালাচ্ছিলে ?" ধমক দিয়ে বলে উঠল, "চুপ করে আছ কেন ? কথা বলো।"

অস্ফুট আর্তনাদ করে চন্দন বলল, "আমি কিছু জানি না। বে-বে-বেদানাদি····।"

"বেদানা ! সে বলেছে আমি খারাপ ? সেই পাগল মেয়েটা ? উদ্ভট গল্প বানাতে যার জুড়ি নেই ?" লোকটা তাকে অতিক্রম করে অনেক দূরের দিকে তাকাল। যেন বাড়ির ভেতর দৃষ্টি পাঠিয়ে বেদানাকে খুঁজল একটু। "ঠিক আছে। সে যদি বলে থাকে আমি খারাপ, তবে আমি তাই। আমি খারাপ। আমার যা মনে হয়, আমি তাই করি। কাজেই তোমাকে যে কাজের জন্যে ধরে এনেছি, তা আমি করবই। দেখি সে কী করে আটকায়। তাকাও। তাকাও আমার দিকে। তাকাও।"

চন্দন মুহূর্তে বুঝতে পারল লোকটা তাকে সম্মোহিত করতে চাইছে। গায়ে কাঁটা দিল তার। ভয়ে চিৎকার করে সে বলে উঠল, "না। না। না। আমায়

সম্মোহিত করবেন না। আমি মরে যাব। আপনার পা-পা-পায়ে পড়ি।"

লোকটা গ্রাহ্য করল না। মন্ত্র পড়ার মতো মোলায়েম গলায় শুধু বলতেই থাকল, "তাকাও। তাকাও আমার দিকে। তাকাও।"

নিজের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করল চন্দন। কিন্তু পারল না। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দু' চোখ খুলে গেল। তাকাতেই হল লোকটার চোখের দিকে। আর তাকাতেই সারা শরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল তার। চোখের সামনে সেই প্রকাণ্ড সুঁচটা ঢুকিয়ে দিল লোকটা তার হাতে। সে অসাড়, চেয়ে চেয়ে দেখল সিরিঞ্জের ওষুধ তার দেহের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। শনশন হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দ ভেসে এল কানে তার। হঠাৎ মনে হল সে যেন একা ডিমনা লেকের বিশাল কংক্রিটের ঢালের ওপর শুয়ে আছে। সমগ্র উপত্যকা জুড়ে বয়ে যাচ্ছে ঝড়। আর ক্রমাগত ঝড়ের শব্দে কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। ক্ষীণ। হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তবু স্পষ্ট নিজের নাম শুনল সে। চন্দন। চন্দন। ওঠ্। ঘাটশিলা এসে গেছে। ওঠ্। কত ঘুমোবি?"

চন্দন চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়ে অবাক। যেন হঠাৎ আলাদিনের জাদু-প্রদীপে ঘষা লেগে গেছে। কোথায় গেল সেই অন্ধকার সিঁড়ি আর ডিমনা লেক! তার বদলে চারপাশ জুড়ে শুধু উজ্জ্বল আলো, হইহই, আর নানা মানুষের কণ্ঠস্বর। স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। আকুল গলায় বলে উঠল, "আমি কোথায়?"

"তুমি ঘাটশিলায়।" ঠাট্টা করে কেউ বলল, "নেমে এসো চাঁদ। আর দেরি করলে গাড়ি ঝাড়গ্রাম চলে যাবে।"

পার্থর গলা। তৎক্ষণাৎ সব মনে পড়ল তার। অন্ধকার কেটে গিয়ে যেন সকালের আলো ফুটে উঠল। আগে যে একবার ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল, সেটাও স্বপ্ন। সত্যিকার জেগে উঠল এই এখন। তড়াক করে বাঙ্কের ওপর ঠেলে উঠে বসল সে। বোকার মতো বলে উঠল, "পার্থ, আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম।"

একই রকম আলগা ঠাট্টার গলায় পার্থ বলল, "তাই নাকি! ভাল। আর দেখিস না। এবার নেমে আয়।"

"তুই বিশ্বাস করবি না পার্থ, সত্যি আমি ঝাড়গ্রাম···।" কথা বন্ধ হয়ে গেল তার। হঠাৎ বুকের মধ্যে বেতালা দুমদাম শব্দে ড্রাম বেজে উঠল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সে বলে উঠল, "কী কাণ্ড! আমি ভাল হয়ে গেছি। আমার তোতলামি নেই। সেরে গেছে। ওরে পার্থ, দ্যাখ্, আমি তোদের মতো কথা বলছি। আটকাচ্ছে না। একদম আটকাচ্ছে না।" বাঙ্ক থেকে প্রায় গড়িয়ে পড়ে যাবার মতো নাচতে নাচতে বলতে লাগল, "ভাল হয়ে গেছি। আমি ভাল হয়ে গেছি। একটা লোক স্বপ্নের মধ্যে আমাকে ইন্‌জেকশান দিল। আমি ভাল হয়ে গেলাম। স্যার, আমি কথা বলতে পারছি। স্যার শুনুন, আমি···।"

তার নাচানাচিতে লোক জড় হয়ে গেল। কিঙ্করস্যার বললেন, "আরে! এটা তো মহাপাগল! খালি লাফায়। কী হয়েছে বলবি তো! স্বপ্নের মধ্যে ওষুধ পেলি?"

"হ্যাঁ স্যার। ইন্‌জেকশান।"

"পায়। যারা খুব সৎ, তারা অনেক সময় স্বপ্নে রোগের ওষুধ পেয়ে যায়।

আমার মা পেয়েছিলেন।"

"আপনার মা তোতলা ছিলেন?"

"না। মাথার যন্ত্রণা। দিন নেই, রাত নেই, মাথা ছিঁড়ে পড়ত। মা খালি ঠাকুরকে ডাকতেন। শেষে একদিন স্বপ্নে একটা লোক হাত মুঠো করে মাকে বলল, নে, ধর। খেয়ে নে, ওঠ। মা হাত পেতে নিয়ে অমনি খেয়ে ফেললেন। ব্যাস। সকাল হতেই মা ভাল। আর যন্ত্রণা নেই।"

"আমাকে ওষুধ না। ইনজেকশান। আমি নিতে চাইনি। জোর করে ঢুকিয়ে দিল।"

"খুব ভাল হয়েছে। দেখেছি তো ক্লাসে কথা বলতে তোর কী কষ্ট।"

কে একজন যেন জিজ্ঞেস করল, "আপনার মা এখনও বেঁচে আছেন স্যার?"

কিঙ্করস্যার উত্তর দেবার আগেই বিমানস্যার বলে উঠলেন, "তা দিয়ে তোর কী হবে? হতভাগা। হ্যাঁ। বেঁচে আছে। চল সব। চল রে। তাড়াতাড়ি ফিরি। ফিরে চন্দনের স্বপ্নের কথা শুনব।"

কিঙ্করস্যার সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। সেই ভাল কথা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়। রাত হয়ে গেছে। হোটেলে গিয়ে শোনা যাবে সব।"

কলকল করতে করতে বেরিয়ে এল সবাই। ইতিমধ্যে এই অলৌকিক খবর ছড়িয়ে পড়েছিল স্টেশন-চত্বরের সর্বত্র। অনেকেই জানতে চায় কী হয়েছে। কিঙ্করস্যারের যেন ক্লান্তি নেই। বারবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে লাগলেন চন্দনের ভাল হয়ে যাবার কথা। যে শুনল সে-ই অবাক হয়ে গেল। চন্দনকে দেখতে চাইল সবাই। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা তারা আগে কখনও শোনেনি। কিঙ্করস্যার তাঁর মায়ের কথাও বললেন সবাইকে। এই সব করতে বেশ দেরি হয়ে গেল। স্টেশনের কাছাকাছি দোকান-বাজার তো আর একটুখানি না! অনেকখানি। কুয়াশামাখা চাঁদের আলোয় হইহই করতে করতে এগোচ্ছিল সবাই।

চন্দন কিন্তু ছেলেদের হইহইয়ের মধ্যে ছিল না। পাগলের মতো নাচানাচির পর এখন সে একটু গুটিয়ে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে এখন তার লজ্জা করছিল। কিঙ্করস্যার বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রাস্তা হাঁটছিলেন তিনি। এটাও ভাল লাগছিল না চন্দনের। অস্বস্তি হচ্ছিল। খুব ইচ্ছে করছিল কোথাও একলা চুপচাপ বসে থাকতে। মায়ের কথা মনে পড়ছিল তার। মা যখন জানবে সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে, মায়ের তখনকার সেই বিস্ময় ও আনন্দের কথা ভেবে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঠিক তখনই সেই ভয়ানক কথাটা মাথায় এল তার। আচ্ছা! এখনকার ব্যাপারটাও স্বপ্ন নয় তো! এই ঘাটশিলা, বন্ধু-বান্ধব, কথা বলতে পারা, এসব সত্যি তো? নাকি আবার কোথাও গাড়ির মধ্যে ঘুম ভেঙে গিয়ে সে দেখবে, এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল, সব স্বপ্ন? ভয়ে কেঁপে উঠল সে। চলতে চলতে কিঙ্করস্যারের সামনে একটা হাত বাড়িয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, "স্যার, আমার এই হাতে একটা চিমটি কাটুন তো। জোরে।"

কিঙ্করস্যার অবাক হয়ে বললেন, "কেন রে?"

"বুঝতে পারব এটা স্বপ্ন নয়। আমি জেগে আছি।"

রাত ফাটিয়ে হেসে উঠল সকলে।

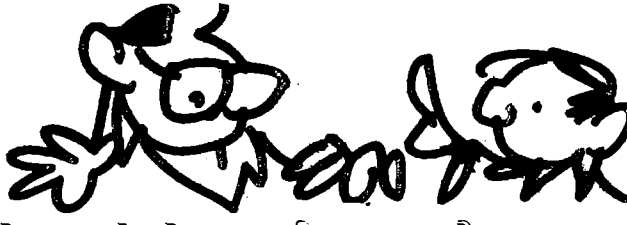

ছোট্‌কা সবে একটা লাইন বলেছে, আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, "জানি, জানি। এ গল্পটা আমরা ছোটবেলায় পড়েছি।"

ছোট্‌কা কিন্তু আমার কথায় কান দিল না। হাতের বইটায় চোখ রেখে পুরো গল্পটাই গড়গড় করে পড়ে গেল। তারপর বইটা বন্ধ করতে-করতে বলল, "এ গল্পটার যেখানে শেষ, আমার ধাঁধার সেখানেই শুরু।"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে ছোট্‌কার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ছোট্‌কা বলল, "কই, কাগজ-কলম কোথায় ?"

কাগজ-কলম সঙ্গেই ছিল। তাই আনতে যেতে হল না। ছোট্‌কা বলল, "আঙুরফল তো আর সত্যি টক নয়। তাই আমার গল্পের শেয়াল প্রচুর আঙুর যোগাড় করেছে। আর প্রত্যেকটা আঙুর মিষ্টি। বুঝলে সতুবাবু ?"

আমি ঘাড়টা কাত করে জানালাম, "বুঝেছি।"

ছোট্‌কা এর পর ধাঁধাটা বলল। শেয়াল আর আঙুর নিয়ে সুন্দর একটা ধাঁধা। সেটাই দিচ্ছি এবার।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা শেয়াল পঞ্চাশটা মিষ্টি আঙুর যোগাড় করেছে। সে ঠিক করল, বেশ কয়েকদিন ধরে এই আঙুরগুলো খাবে।

কদিনে খাবে ? তা নিয়েও বিস্তর ভাবনাচিন্তা করেছে সে। তারপর ঠিক করেছে, পাঁচ দিনে পঞ্চাশটা আঙুর খাবে সে।

পাঁচ দিনে পঞ্চাশটা আঙুর মানে, প্রতিদিন দশটা করে হয়। সে তো সবাই জানে। এ আর এমন কী ব্যাপার !

কিন্তু এই শেয়ালটার ছিল তুখোড় অঙ্কের বুদ্ধি। তাই সে ঠিক করল, পাঁচদিনেই খাবে, কিন্তু হিসেবটা হবে জটিল। বুদ্ধি খাটিয়ে সেই হিসেব বুঝতে হবে।

কী হিসেব ? না, প্রথম দিনে সে যে-কটা আঙুর খাবে, পরের দিন খাবে তার থেকে তিনটে বেশি। তার পরের দিন আগের দিনের থেকে আবার তিনটে বেশি। অর্থাৎ রোজই সে আগের দিনের থেকে তিনটে করে বেশি আঙুর খাবে।

এইভাবে ঠিক পাঁচ দিনে তার পুরো পঞ্চাশটা আঙুর খাওয়া হয়ে গেল। কী নিখুঁত হিসেব, ভেবে দ্যাখো।

তোমরা বলতে পারো, প্রথম থেকে পঞ্চম দিন পর্যন্ত তার আঙুর খাবার হিসেবটা কী ছিল ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বলতে পারো, সপ্তম জন্মদিনে একটি মেয়ের কী হয় ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

তা হ রি কা ঠ

গতবারের উত্তর ॥ (১) মাধবীর স্বামীর ঘরের খেলায় আগ্রহ কম, তাই মাধবী ক্যারাম চাম্পিয়ানের, অর্থাৎ বিদ্যুতের, স্ত্রী হতে পারে না। মাধবী সাঁতারু। তাই তার স্বামীর নাম দীপকও নয়, কেননা, দীপকের স্ত্রী সাঁতার জানে না। সুতরাং মাধবীর স্বামী জ্যোতির্ময়। শাশ্বতী—দীপকের বোন বলে— বিদ্যুতের স্ত্রী। কল্পনার স্বামী দীপক। (২) অনিন্দ্যসুন্দর। (৩) 'ব' অক্ষর।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■				■	
৫	৬	■	■	■	৭	
৮			■	৯		
	■	■	■	■	■	
	■	১০	■	১১	■	
১২			■	১৩		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বিদেশী খেলাবিশেষ। (৩) আগুন-ধোঁয়ায় আকাশে ওড়ে। (৫) বিখ্যাত ইংরেজ কবি। (৭) গম্ভীর ধ্বনি। (৮) মাছবিশেষ। (৯) সম্প্রতি। (১২) গর্তপথ। (১৩) ব্যাকরণে কোন্ অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় ?

উপর-নীচ (১) নামে-ছদ্মনামে চিনি, অতীব বিখ্যাত তিনি। (২) চাঁদ। (৩) লাঙলের ফলা। (৪) বিখ্যাত বাঙালি কবি। (৬) পদ্ম। (৭) ফুলের মধ্যে বাস, মৌমাছিদের আশ। (১০) কোনো-কোনো পশুর থাকে আর থাকে পর্বতের। (১১) সাধুর সম্মুখে জ্বলে। জল নিয়ে বয়ে চলে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বে	লু	ন	■	তো	প	■
হুঁ	■	■	আ	তা	■	স
শ	খ	■	ম্র	■	শা	খী
■	গো	লা	প	জা	ম	■
গো	ল	■	ল্ল	■	লা	জ
রা	■	দা	ব	■	■	ম্বু
■	পা	রা	■	শা	লি	ক

মজার খেলা

খুব সহজ-সুন্দর একটা খেলা শিখব এবার। এ-খেলাটা যখন-তখন বন্ধুদের সামনে খেলা যায়। এর জন্য উপকরণও সামান্য। সাতটা দেশলাইকাঠি, কিংবা ওই মাপের অন্য কাঠি।

সাতটা কাঠিকে নীচের ছবির মতন করে টেবিলে সাজাও :

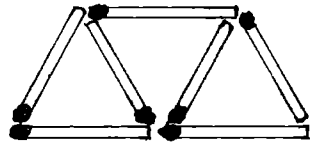

সাজিয়েছ ? এবার এটা বন্ধুদের দেখিয়ে বলো, তিনটে ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে সাতটা কাঠি দিয়ে। বন্ধুর কাজ হবে এর থেকে দুটো কাঠি তুলে নিয়ে ফের এমনভাবে সাজানো, যাতে কিনা একটা ত্রিভুজ কমে যায়, অর্থাৎ তখন টেবিলে থাকবে, মোট দুটো ত্রিভুজ।

বন্ধু চেষ্টা করুক। যত বুদ্ধিমান বন্ধুই হোক, খুব সহজে কিন্তু হবে না তার সমাধান। হলে তো বুঝতে হবে, দারুণ বুদ্ধি তার। কিন্তু না হলে ? অর্থাৎ, বন্ধু যদি হাল ছেড়ে দিয়ে তোমাকেই ধরে ? বলে যে, তুমি নিজে করে দেখিয়ে দাও, তখন ?

তখন ? তখন তুমি দারুণ বুদ্ধিমানের মতো নীচের সমাধানের মতো করে বন্ধুদের ব্যাপারটা শিখিয়ে দাও—

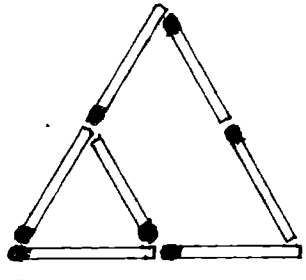

কী, খুব সহজ মনে হচ্ছে এখন ?

মজারু

কিসের ফোটো

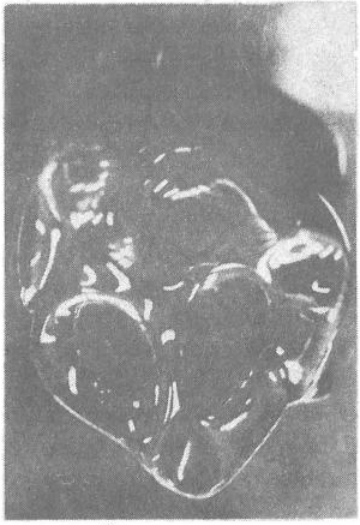

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল পরপর সাজিয়ে-রাখা খাতার ফোটো।

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ এতগুলো কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে থাকলে সকালবেলা তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার সময় খুঁজে বার করব কী করে ?

উঃ একটা পেজমার্ক দিয়ে রাখো।

প্রঃ এই 'শট'টাতে এত উঁচু থেকে লাফাতে বলছেন, নীচে পড়লে কি আর বাঁচব ?

উঃ কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, সিনেমার একেবারে শেষ দৃশ্যটাই তোলা হচ্ছে।

প্রঃ যারা খুব রেগে গেলেও দাঁত কিড়মিড় করে না তাদের কী বলে ?

উঃ ফোকলা।

সুসেন

হাসিখুশি

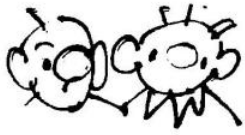

"দাদু মারা যাবার সময় আমার জন্য দশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছেন।"

"আমার দাদু মারা যাবার সময় সারা পৃথিবীটাই রেখে গিয়েছেন।"

"নিজের হাতে কেক বানিয়েছি। খাবে নাকি একটু ?"

"খাব, কিন্তু হজমের ওষুধ আছে তো ?"

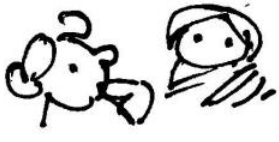

"তুমি কেন স্কুলে যাও পাপান ?"

"বা রে, স্কুলে না গেলে যে ছুটিগুলো পেতাম না !"

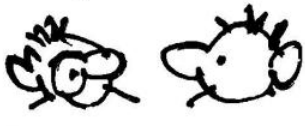

"বাজারে অনেক দেনা। পাওনাদারদের কী করে ঠেকাই বলুন তো ?"

"পাওনাদাররা এলেই বলুন না, চোখ খারাপ হয়ে গেছে, কাউকেই চিনতে পারছেন না।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

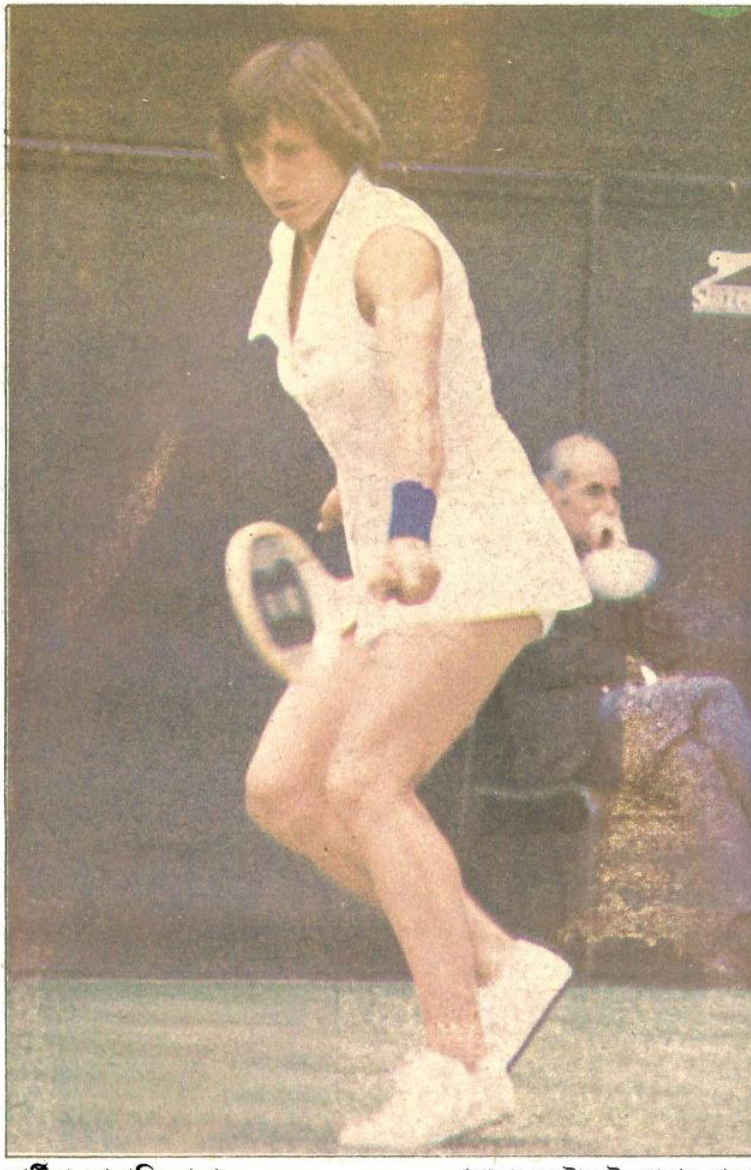

ফোটো : এ. পি. ফোটোকালার

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

(পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

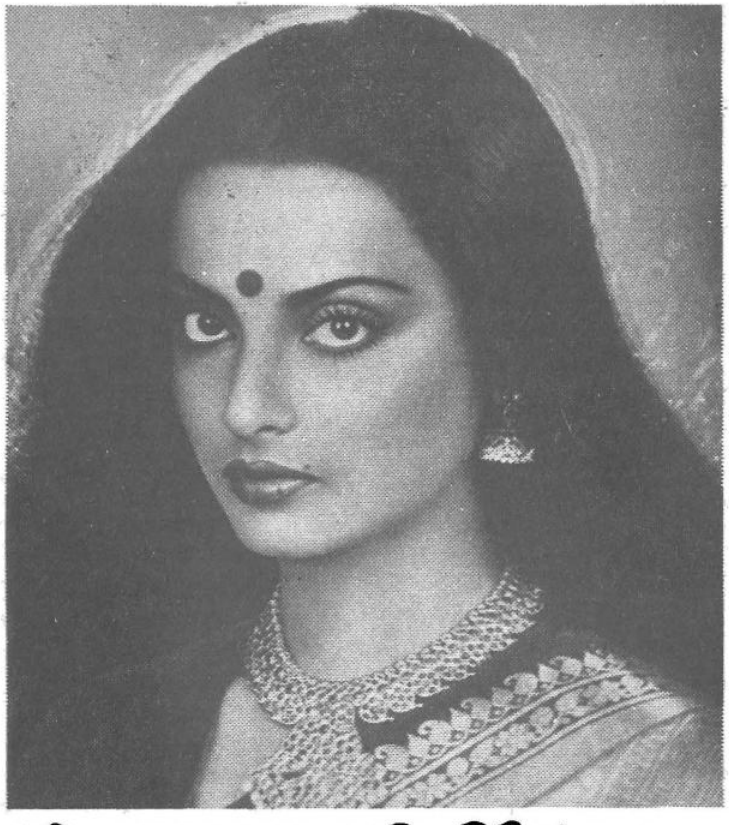

"যৌবনের যে কোনো চাওয়া, সবই আমি কি ক'রে যায় না পাওয়া..."

"...হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আর তার জন্যে
আমি খাটিও যে দারুণ। অভিনয়ের সময় বেছে
নিই সেরা চরিত্র, আর বদলে দিই আমার সেরা
অভিনয়ও—শরীর ও মন প্রাণপূর্ণ
রাখতে, একনাগাড়ে করি যোগাভ্যাস—
আর আমার গায়ের ত্বকের যত্ন নিতে চাই শুধু
আমার প্রিয় সাবান লাক্স-ই"

শুভ্র, স্নিগ্ধ লাক্স—চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

HLL-8714

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

টেনিসের রানি

সুজয় সোম

রোববার, ১৯৮৪ সালের ৪ মার্চ, রাত্তিরবেলা, নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের কোর্টে ভার্জিনিয়া স্লিমস টেনিস-এর ফাইনাল খেলা ঘিরে পনেরো হাজার দর্শকের টগবগে উত্তেজনা। টেনিস-পৃথিবীর দুই সেরা মেয়ের রোমাঞ্চকর লড়াই দেখার লোভে ভরসন্ধে থেকেই হাপিত্যেশ, ছটফটানি। বিরাশি বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মেয়েদের ম্যাচে পাঁচ সেট খেলার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চার সেটও খেলা হল না। ১১৩ মিনিটেই স্ট্রেইট সেটে ক্রিস এভার্ট লয়েডকে বেমালুম নাকানি-চোবানি খাইয়ে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার—প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার পুরস্কার জিতে নিলেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা।

রোমাঞ্চকর লড়াই হল না। প্রথম সেটে গুছিয়ে ওঠার আগেই ক্রিসকে কোণঠাসা করে ফেললেন মার্টিনা। মার্টিনার যেমন স্পিড, স্ট্রোক, আর তেমন কোর্ট ক্র্যাফট। তৃতীয় ও নবম গেমে ক্রিসের সার্ভিস ভাঙলেন। ৬-৩ গেমে জিতে গেলেন শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় সেটের প্রথম গেমেই আচমকা নাভ্রাতিলোভার সার্ভিস ভেঙে লড়াইয়ে ফিরে এলেন এভার্ট। কিন্তু সাত নম্বর গেমের পর দেখা গেল ৪-৩ গেমে ক্রিস এগিয়ে। পরের গেমেই ক্রিসের সার্ভিস ভেঙে ব্যাপারটা সামলে নিলেন মার্টিনা। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের সার্ভিস থেকে ৫-৪ করার পর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। সেট জিতলেন ৭-৫ গেমে।

পর-পর দুটো সেটে হেরে ক্রিস কেমন যেন চুপসে গেলেন। তাঁকে কিছুটা তাচ্ছিল্য করেই তৃতীয় সেটে মার্টিনা জিতলেন ৬-১ গেমে। কেন জানি না, গোড়া থেকেই নেটের দিকে এগিয়ে এসে স্ট্রোক করতে দ্বিধা করছিলেন ক্রিস। ঘেমে-নেয়ে টেন্টে ফিরে মুচকি হেসে শ্রীমতী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা বললেন, "ঠিক করেই রেখেছিলুম তিন সেটের বেশি খেলব না।"

মার্টিনা আসলে চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে। সতেরো বছর বয়সে, ১৯৭৪ সালে, পালিয়ে এলেন আমেরিকায়। একাশি সালে পেলেন মার্কিন দেশের নাগরিকত্ব। ক্রিস মার্কিন মুলুকেরই মেয়ে। মার্টিনা আমেরিকায় আসার পর থেকেই দুজনের ভারী বন্ধুত্ব। একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আড্ডা মারে, সিনেমা দেখতে যায়। টেনিস কোর্টের বাইরে যত ভাব, কোর্টের ভেতরে তত আড়ি। টেনিস-পৃথিবীর এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড় হবার জন্য দুজনেরই পড়ি-মরি লড়াই। ইঁদুর-দৌড়ে আপাতত মার্টিনাই কিছুটা এগিয়ে। তবে দুজনেই এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রথম সারির সব টেনিস প্রতিযোগিতার মেয়েদের বিভাগে সেরা আকর্ষণ। সার্ভ, ভলিতে দুজনেই দারুণ পোক্ত। ফোরহ্যান্ড, ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকেও প্রায় সমান দক্ষ। ক্রিস অবিশ্যি মূলত বেস লাইন প্লেয়ার। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐতিহ্যপূর্ণ এবং গ্ল্যামারাস টেনিস-যুদ্ধ উইম্বলডনের ফাইনালে আটবার খেলে তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ক্রিস। মার্টিনা চারবার ফাইনালে উঠে প্রতিবারই জিতেছেন।

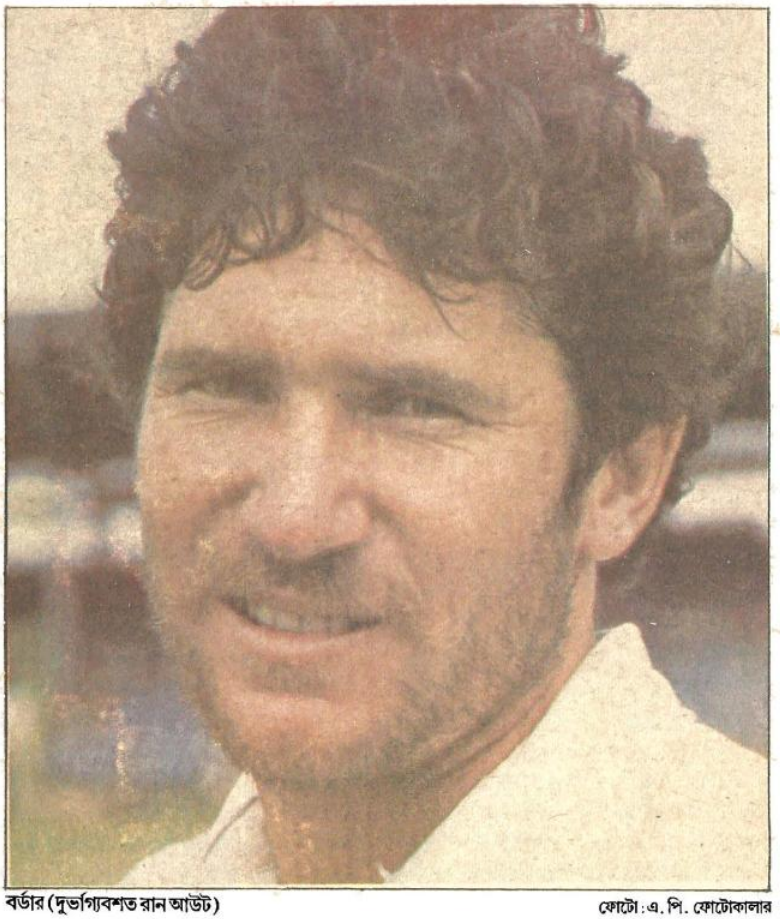

বর্ডার (দুর্ভাগ্যবশত রান আউট)

ফোটো : এ. পি. ফোটোকালার

জর্জটাউনে ড্র

মণি শর্মা

জর্জটাউন অবাক করল সবাইকে। প্রথম টেস্টে বিখ্যাত 'চতুষ্টয়' নয়, তিনজন ক্যারিবিয়ন পেসার খেলেছেন। আশি সালে ফয়সলাবাদ টেস্টের পর, এমন দৃশ্য দেখা যায়নি বিগত বছরগুলিতে। মার্শাল ও হোলডিং আনফিট, তাই তাঁদের বাদ দিয়ে দল গড়তে হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। আর তাতেও অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে প্রায় ধসে পড়েছিল। বাঁচিয়ে দেন ফাস্ট বোলার রডনি হগ আর স্পিনার টম হোগান। শেষ উইকেটের জুটিতে তাঁদের

বিচ্ছিন্ন করতে লয়েড প্রচুর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমনকি, দ্বিতীয় নতুন বলের আক্রমণও শানানো হয়েছে। কিন্তু জুটি ভাঙল শেষ উইকেটে ৯৭ রান তোলার পর। নতুন রেকর্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অন্তিম জুটিতে এর আগের রেকর্ড ছিল গ্লিসন ও কনোলির। '৬৮-৬৯ সালে সিডনিতে তাঁরা ৭৩ রান করেছিলেন। হগ ও হোগানের জন্যই অস্ট্রেলিয়া ২৭৯ রান পৌঁছতে পেরেছে। নয়তো দলের স্কোর দুশো পেরোত কি না সন্দেহ।

ব্যাটে সাহায্য করার পর হগ এবং হোগান বলেও খেল্ দেখিয়েছেন। লসন ও হগ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানদের প্যাভিলিয়নে ফেরানোর কাজ সফলভাবে শুরু করার পর আক্রমণকে সম্পূর্ণতা দেন হোগান। পেস ও স্পিনের চাপের মুখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভেঙে পড়ে। একমাত্র হেন্স ছাড়া আর কেউ বুক চিতিয়ে অস্ট্রেলীয় বোলারদের মোকাবিলা করতে পারেননি। অধিনায়ক লয়েড ঠেকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অফস্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করে তিনি আউট হন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে যবনিকা পড়ে ২৩০ রানে।

৪৯ রানে এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ফের বিপাকে পড়ে গার্নার ও ড্যানিয়েলের বলে। বাঁ-হাতি বর্ডার ও ফিলিপসের চেষ্টায় রান সংখ্যা দুশোর ঘর পেরিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত রানআউট হয়ে যান বর্ডার। ভুল বোঝাবুঝির ফল। বর্ডার (৫৪) ও ফিলিপসকে (৭৬) সাহায্য করেছেন লসন। বেপরোয়া ভঙ্গিতে ৩৫ রান করে অপরাজিত থেকে গেছেন তিনি। ৯ উইকেটে ২৭৩ রান তুলে অস্ট্রেলিয়া দান ছেড়ে দেয়।

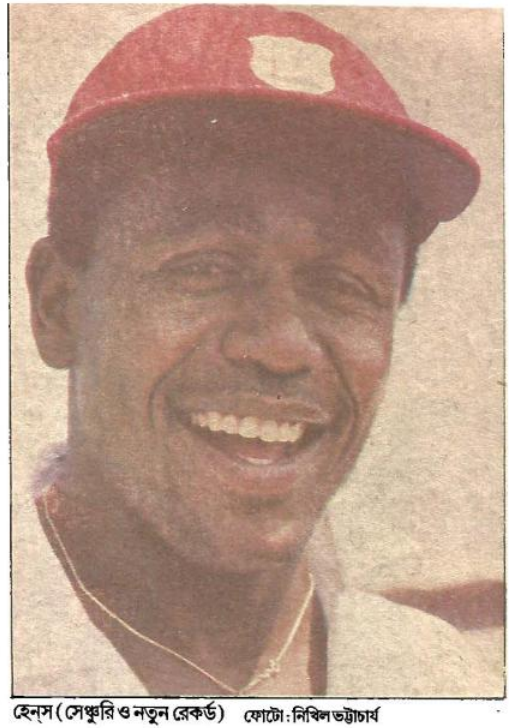

হেন্স (সেঞ্চুরি ও নতুন রেকর্ড) ফোটো: নিখিল ভট্টাচার্য

জয়ের জন্য ৩২৩ রান প্রয়োজন, এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে নামে। হাতে সময় দুশো মিনিট এবং কুড়িটি ম্যাণ্ডেটরি ওভার। হেন্স এবং গ্রিনিজ কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। দুটি ঝকঝকে সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা। গ্রিনিজ নট আউট ১২০, হেন্স নট আউট ১০৩। বিনা উইকেটে আড়াইশো রান করার পর, খেলা শেষ হতে চার ওভার বাকি থাকতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলা ছেড়ে দেয়। অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় প্রথম টেস্ট। হেন্স গ্রিনিজ প্রথম উইকেটের জুটিতে নতুন রানের রেকর্ড করেছেন। এর আগে ১৪৫ রানের রেকর্ড ছিল কনরাড হান্ট ও ব্রায়ান ডেভিসের। বলে ব্যাটে সাফল্যের জন্য হোগান 'ম্যান অব দি ম্যাচ' হয়েছেন।

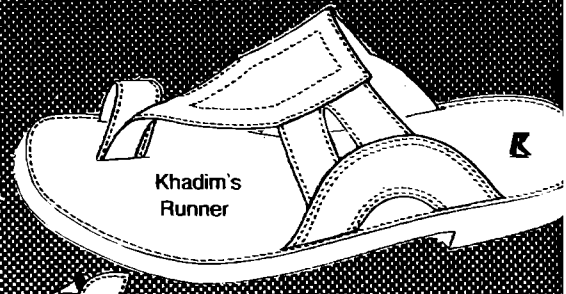

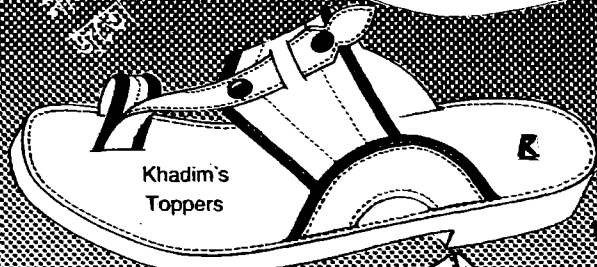

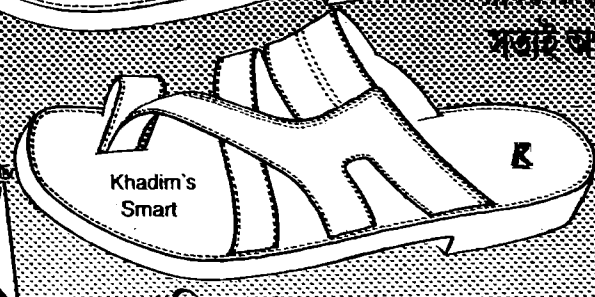

টেকসই জুতো না বলে
বলো
বুটেকসই
খাদিমের বুটেক্স
Khadim's
Runner
Khadim's
Toppers
সত্যই অপূর্ব !
Khadim's
Smart
KHADIM'S BUTEX
কে এম খাদিম অ্যাণ্ড কোং
২১-এ রবীন্দ্রসরণী (১৫০ বি লোয়ার চিৎপুর রোড) কলিকাতা-৭০০০৭৩ ফোন : ২৬৭৬৬৪

ফয়সলাবাদে ড্র

সুব্রত সিংহ

পাকিস্তান ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ফয়সলাবাদের দ্বিতীয় টেস্টটির কোনো ফয়সলা হল না। এই টেস্টটি যে অমীমাংসিতভাবেই শেষ হবে, তা প্রথম দু'দিনের খেলার পরেই অনুমান করা গিয়েছিল। এই টেস্টে ভাঙা দল নিয়ে ইংল্যাণ্ডের প্রশংসনীয় লড়াই ও তিনটি সেঞ্চুরি ছাড়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে তেমন কিছুই ছিল না।

এই টেস্টে ইংল্যাণ্ডকে ভাঙা দল নিয়ে নামতে হয়েছিল। কেননা, এই টেস্ট শুরুর ঠিক আগে তাদের তিন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়, অধিনায়ক বব উইলিস্, ইয়ান বথাম ও নর্মান কাওয়ান্স অসুস্থতার দরুন দল থেকে সরে দাঁড়ানোয় ইংল্যাণ্ড দল যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাদের বোলিং-শক্তি বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের ব্যাটস্ম্যানরা যখন

ডেভিড গাওয়ার (অধিনায়কোচিত ইনিংস)

একটি বিরাট রানের ইনিংস গড়েন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, এবারেও হয়তো ইংল্যাণ্ড কোণঠাসা হয়ে পড়বে। একটি টেস্টে পিছিয়ে পড়ে ও ভাঙা দল নিয়ে খেলতে নেমে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু সেই চাপ থাকা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা শুধু যে প্রশংসনীয়ভাবে লড়লেন তা নয়, উপরন্তু পাকিস্তানের ওই বিরাট রানকে (৪৪৯-৮ ডিঃ) অতিক্রম করে বেশ কিছু রানের ব্যবধানও গড়ে তুলেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের এই বিরাট রানের (৫৪৬-৮ ডিঃ) ইনিংস গড়তে যিনি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি হলেন এই টেস্টের জন্য নির্বাচিত অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার। গাওয়ারের একটি অনবদ্য সেঞ্চুরি (১৫২) পাকিস্তানের রানকে অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এটিই তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। এছাড়া তিনি টেস্টে চার হাজার রানও পূর্ণ করেন।

গাওয়ারের সেঞ্চুরিটি ছাড়া এই টেস্টে আরও যে দুটি সেঞ্চুরি হয়েছে সে দুটি করেছেন পাকিস্তানের দুই নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় সেলিম মালিক (১১৬) ও ওয়াসিম রাজা (১১২)।

তিন টেস্ট সিরিজের একটি টেস্টে জিতে ও এই টেস্টটি অমীমাংসিত রেখে পাকিস্তান এখনও সিরিজে এগিয়ে। তাদের এই অগ্রগমন বজায় রাখতে, এবং সিরিজ ও রাবার জিততে হলে লাহোরের তৃতীয় টেস্টটিকে অন্ততপক্ষে অমীমাংসিত রাখতেই হবে। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডকে 'রাবার' দখলে রাখতে তৃতীয় টেস্টটিতে জিততেই হবে।

ফ্ল্যাশ গর্ডন

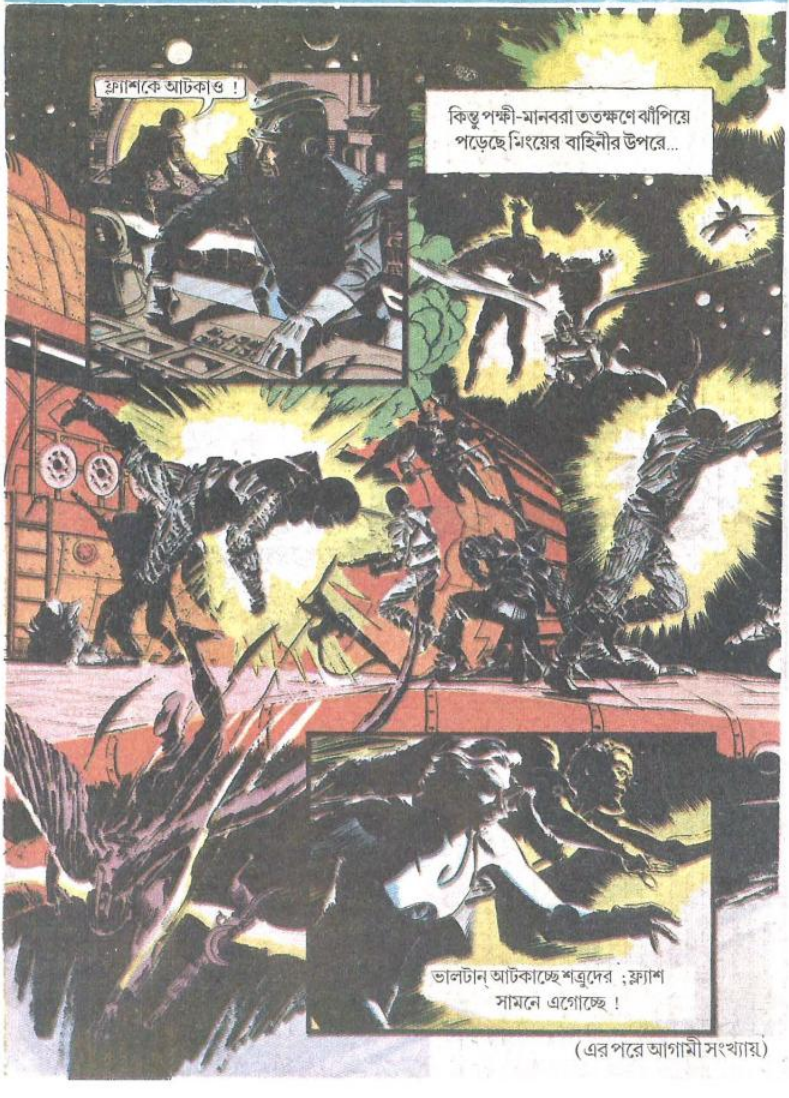

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু

"ওফ ! ঠেকে শিখেছি,
সস্তা পাউডার আর নয়।
আমার বাবা ন্যাটই ভাল।"
সত্যিই ন্যাটের অনেক গুণ। খাস জার্মান পদ্ধতিতে তৈরী তাই দানাগুলি অনেক হাল্কা অথচ জোরালো—ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পরিমাণ পাউডার পাওয়া যায়। তাছাড়া বাজারের অন্যান্য পাউডারে যেমন "সোডা অ্যাশ" ভরা থাকে, ন্যাটে তত থাকে না। তাই কাপড় টেঁকেও বেশিদিন, আর হাতেরও ক্ষতি হয় না।
ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।
High Grade
Gnat
Detergent Powder
A Kusum Product
C84.9 BEN

চম্বলের চশমা

প্রসাদ

বাবার সঙ্গে চম্বল চলেছে বৌবাজার, আজ তার নতুন চশমা হবে। কী রকম চশমা নেবে, চম্বল আগে থেকেই মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে। অবশ্য, তার দাম যদি খুব বেশি হয়, বাবা তাহলে রাজি হবেন কি না কে জানে। যেতে-যেতে চম্বল লক্ষ করছিল, কে কী রকম চশমা পরেছে। একজনের চোখে দেখল খুব হালকা সোনালি ফ্রেমের চশমা।

Chambal rather liked those glasses.

But they looked expensive.

Chambal thought, "I'd better not expect too costly a pair. Daddy wouldn't like it."

"And, in any case," Chambal said to himself, "I would rather have a heavier frame."

Absorbed in his thoughts, Chambal hadn't noticed that the tram had stopped for quite some time. There was a terrific traffic-jam. There was no knowing when the traffic would start moving again.

Daddy said, "We'd better walk the rest of the way."

Chambal too felt he would rather walk. He had been sitting in the tram for a long while and was feeling cramped.

It didn't take them more than five minutes to reach the shop.

"If I'd known we had come so close to the shop," Daddy said, "I'd have got off the tram long ago."

Of course, Chambal knew his father was very fond of walking.

He would rather walk a few kilometres than ride in trams or buses.

চশমার দোকানে ভিড় বেশ ছিল, কিন্তু চম্বল দেখল, বাবাকে দেখা মাত্র একজন এগিয়ে এলেন। তারপর, বাবা চম্বলের চশমার কথা বলতে তিনি নানা রকমের ফ্রেম চম্বলের সামনে হাজির করলেন।

"Would you rather have a dark-coloured frame or a light-coloured one?" He asked Chambal.

"Very dark, please," Chambal replied, "and very heavy."

That's the kind of glasses the Headmaster of Chambal's school wears, and that's the kind Chambal has always wanted for himself.

Alas, Chambal's choice was vetoed by Daddy.

"They're too heavy for a boy of your age," he said.

The shop-assistant also agreed with Daddy.

He said, "I would rather not recommend them for you. They are for grown-ups.

So, Chambal came home with glasses with thin, golden coloured, rims.

লক্ষ করো এই কথা দুটির ব্যবহার

WOULD RATHER

I would rather have a heavier frame.

He would rather walk.

Would you rather have a dark-coloured frame?

I would rather not recommend them for you.

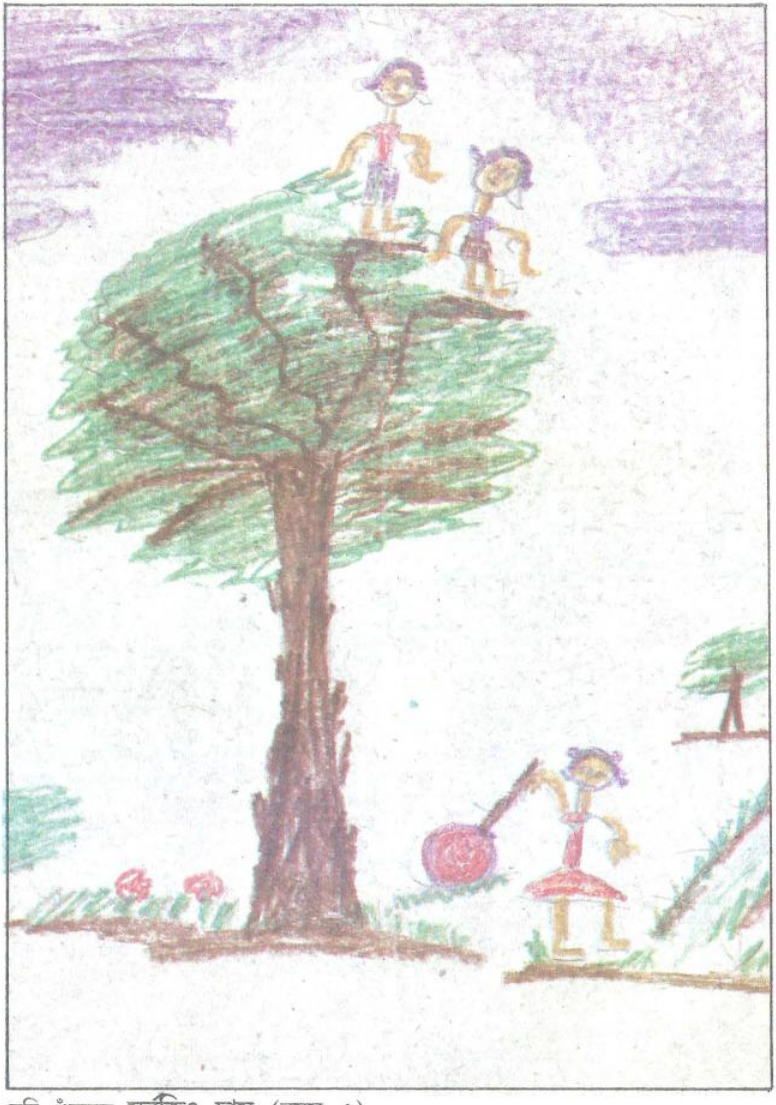

ছবি এঁকেছে **সর্বজিৎ দাস** (বয়স ৫)

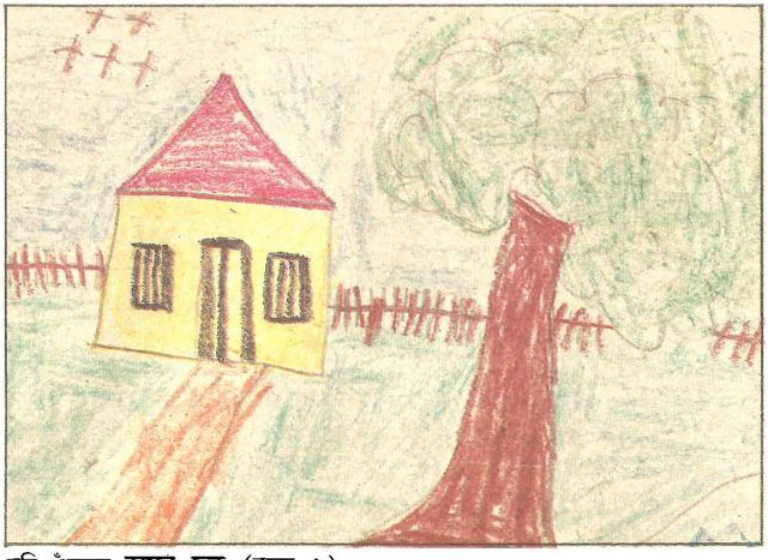

ছবি এঁকেছে **অয়ন দত্ত** (বয়স ৬)

ছবি এঁকেছে **সঞ্জয় দাস** (বয়স ১০)

বানান শেখার নানান মজা

অনেকে ভাবেন, বাংলা বানানের কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম আর এখন নেই। ইচ্ছেমতো লিখলেই হল। বানান নাকি সহজ করা হয়েছে, কোনও জটিলতা আর নেই।

অনেকে আবার উল্টোরকম ভাবেন। তাঁদের কাছে, বাংলা বানান হল বিভীষিকা। এই বিধি, ওই নিয়ম, এই ঝামেলা, ওই ঝঞ্ঝাটে ভর্তি। তোমরা কোন্ দলে? যে-দলেই থাকো না কেন, 'কুন্তক'-এর লেখা 'শব্দ নিয়ে খেলা' আর দেব সেনাপতির 'বানানোর ছড়া' বইদুটো কিন্তু পড়ে নিতে ভুলো না। দেখবে, বাংলা বানানের খটমট নিয়মকানুন কেমন খেলাচ্ছলে জানা হয়ে যাচ্ছে। শব্দের গঠনে যে দারুণ রকমের মজা লুকনো রয়েছে তা কেমন সহজে ধরা পড়ছে তোমাদের কাছে। এমন-কি শক্ত শক্ত বানান আর তার নিয়মগুলো কেমন গল্পচ্ছলে গেঁথে যাচ্ছে মাথায়। একদমই বানান ভুল করছো না আর।

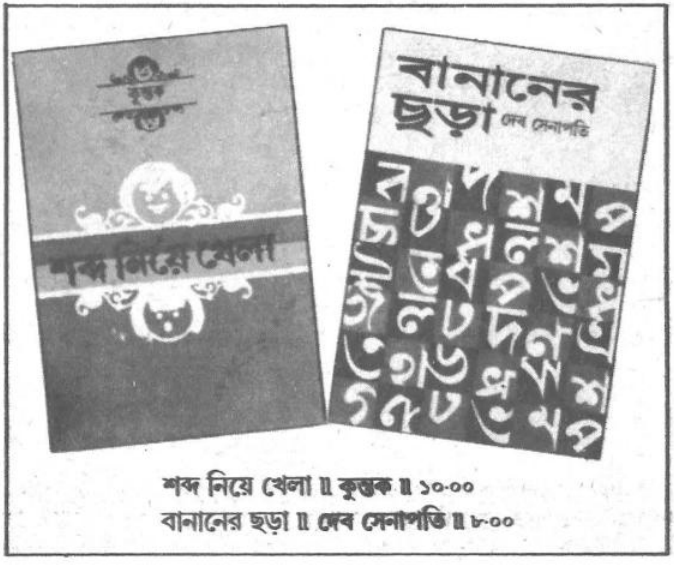

শব্দ নিয়ে খেলা ॥ কুন্তক ॥ ১০-০০
বানানের ছড়া ॥ দেব সেনাপতি ॥ ৮-০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ ফোন ৩৪৪৩৬২

মেঘের দেশে

আমরা দিল্লি, দেরাদুন হয়ে মুসৌরি বেড়াতে গিয়েছিলাম। মুসৌরিতে খুব ঠাণ্ডা ছিল। আমরা একটা মোটরে করে মুসৌরিতে পৌঁছেছিলাম। যাবার পথে অনেক পাহাড় পেয়েছিলাম পথের দুপাশে। উঁচু. আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যেতে খুব ভয় করছিল। মুসৌরিতে আমরা দুদিন ছিলাম।

পাহাড়ের ওপর অনেক সময় মেঘ দেখা যায়। আমরা মেঘের ভেতর দিয়ে হেঁটেছিলাম। সেখানে অনেক দোকানপাট।

মুসৌরি খুব সুন্দর শহর। ওখান থেকে ফিরে আসার সময় খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

দীপাঞ্জন গোস্বামী (বয়স ৬)

বৃষ্টি পড়লেই

বৃষ্টি পড়লে আমার খুব আনন্দ হয়। মা কিন্তু রাগ করেন। বাবার বাজার যাওয়া হয় না। মায়ের রান্নার দেরি হয়ে যায়। ভিজে কাপড় থেকে জল পড়ে, শুকোয় না।

আমার দিদি রুমি ঝাঁকড়া চুলে শ্যাম্পু মাখতে চায়। বৃষ্টি হচ্ছে বলে মা বারণ করেন। দিদি রাগ করে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

অফিস যেতে পারেন না বলে বাবা মুখ গোমড়া করে বসে থাকেন। শুধু আমার আনন্দ।

আমি ঝমঝমে বৃষ্টি দেখি। রাস্তার জমে-ওঠা জলে লাল নীল কাগজের নৌকো ভাসাই।

বৃষ্টিতে বল নিয়ে ছুটোছুটি করি। সব্বাই আমাকে ধরতে চায়। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে কেউ আমাকে ছুঁতে পারে না।

অরূপ মুখোপাধ্যায় (বয়স ১২)

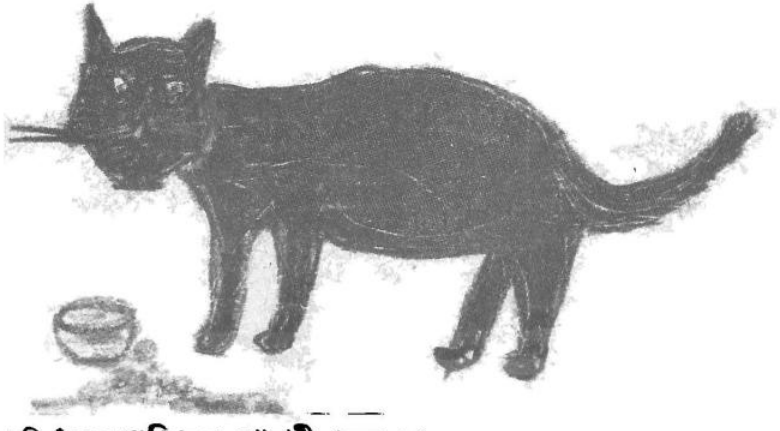

ছবি এঁকেছে **অভিষেক গোস্বামী** (বয়স ৮)

আরে, আমিই কি তোকে...
শিকল পরিয়ে রাখতে চাই?
শিকল না-পরালে তুই পালিয়ে যাস যে!
সেইজন্যেই শিকল পরিয়ে রাখতে হয়।

বনস্পতি অনেক আছে, কিন্তু ডালডা হল একটিই

মমতার কষ্টিপাথরে বংশপরম্পরা ধরে সফল

গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গৃহিনীদের বিশ্বাসপাত্র··· ডালডা। এটি শুধু নিরামিষ তেলেরই উৎপাদন— সীলবন্ধ— বিশুদ্ধ, শতকরা একশ ভাগ বিশুদ্ধ··· মুখরোচক রান্নার জন্যে যার জুড়ি নেই— আর সবার সেরাও···কারণ, আপনি আপনার পরিবারের জন্যে সবসময় সবার সেরা জিনিষকেই তো স্বাগত জানান।

ডালডা
ব্র্যাণ্ড বনস্পতি

শুধু নিরামিষ তেল দিয়ে পালিত-পোষিত

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS DLD 19 15 9 BG

২* বোরোলীন অলিম্পিক গল্পমালা

আধুনিক যুগ

তোমাদের হয়ত অজানা যে বহু বছর আগে বিশ্ব অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়। কার জন্য বন্ধ হয়, সেটা জেনে রাখা ভাল। ৩৯৩ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসের নির্দেশে অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের ব্যারন পিয়ের দ্য কুবারতাঁর অসীম উৎসাহে ঐ গ্রীস দেশের এথেন্স শহরে আধুনিক অলিম্পিক শুরু হয়।

আধুনিক অলিম্পিকের মূলমন্ত্র: 'সিটিয়াস, অলটিয়াস, ফর্টিয়াস' যার মানে আরো দ্রুত, আরো উঁচুতে ও আরো জোরে।

অলিম্পিকের পতাকা আকাশে ওড়ে ১৯২০ সালে এন্টওয়ার্প অলিম্পিকে। পতাকায় আঁকা ৫টি বৃত্ত, ৫টি মহাদেশের মৈত্রী বন্ধনের প্রতীক। প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় পতাকাতে এই বৃত্তের রঙগুলির যে কোন একটি পাওয়া যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে অলিম্পিক হতে পারে নি। কারণ তখন প্রায় সব দেশই যুদ্ধের উন্মাদনায় গ্রস্ত। এরপর ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে বহু দেশ রাজনৈতিক কারণে অংশ নেয় নি।

তবু সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে খেলাধূলার এই শ্রেষ্ঠ উৎসব আজও চলছে।

*তোমার বোরোলীন অলিম্পিক অ্যালবাম জমাচ্ছ তো? আগামী সংখ্যাগুলোয় নজর রেখো।

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

HTC-GDP-5419

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮